মহাকরণ

শুভ্রাংশু গুপ্ত

জনতা পাবলিশার্স
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

জনতা সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৭১

প্রকাশক
এন. সেনগুপ্ত
১১ বি, ধীরেন ধর সরণী, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ—গণেশ বসু

মুদ্রাকর
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

পিতৃদেব জীবেন্দ্রকুমার গুপ্তের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

Human Society is an arch,
kept from falling by the mutual
pressure of its parts.

—*Seneca*

পুশ বাটন টিপতেই অটোমেটিক লিফটটা দোতলায় এসে থেমে গেল। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন অরুন্ধতী। তারপর পায়ে পায়ে করিডর ধরে নিজের চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন। ব্রিফ-কেস, টিফিন-ক্যারিয়ার এবং জলের ফ্লাস্ক হাতে তাঁর আগে আগে চলল বেয়ারা বনমালী।

কলকাতার সেক্রেটারীয়েটে অরুন্ধতী হলেন একমাত্র মহিলা আই. এ. এস. অফিসার। তিনি উচ্চতায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়েদের তুলনায় একটু বেশিই। তাঁর নাক টিকালো, টানা টানা চোখ বড় সান-গ্লাসে ঢাকা পড়েও বাইরে থেকে বেশ স্পষ্ট। গায়ের রং অনেকটা চাঁপাফুলের মতন। পরনে বট্‌লগ্রিন ফুলভয়েলের ছাপা শাড়ি, নাভির কাছে পাট করে সায়ার দড়িতে ভাঁজ করে ঢোকানো। গায়ে একই ব্লাউজপিসের পাতলা হাত-কাটা জামা, যার ভিতর থেকে টাইট বডিস-আঁটা সপুষ্ট যৌবনের স্পষ্ট ইঙ্গিত। নাভির কাছে যেখানে একেবারে খোলা, বেশ কিছুটা মেদবহুল। ডানহাতের মণিবন্ধে রেডিয়াম দেওয়া কালো রঙের বড় ডায়ালের হাতঘড়ি, চওড়া স্ট্র্যাপ-ব্যাণ্ডে বাঁধা। পায়ে মিডিয়াম-হিল জুতো। ঠোঁটে আলতো করে লিপস্টিক। অরুন্ধতীর বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে যে-কোন জায়গায়।

অরুন্ধতীকে চীফ মিনিস্টার, ডেপুটি চীফ মিনিস্টারের ঘর, সেদিনও যে ঘর দুটোর একটিতে রাজ্যপাল, অপরটিতে পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বসেছেন, পেরিয়ে তাঁর চেম্বারে আসতে হল। করিডরের এপাশে-ওপাশে টুলের উপর যে-সব বেয়ারা-পিয়ন বসে ছিল, তাদের কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়ে অরুন্ধতীকে সসম্ভ্রম সেলাম দিল। কেউ আবার উপেক্ষা করে গেল। অরুন্ধতী যেন দেখেও

দেখলেন না। একবার মাত্র মুখ তুলে সামনের বড় ওয়ালক্লকটার দিকে তাকিয়ে সময় দেখে নিলেন। দশটা বাজতে তখনও কয়েক মিনিট বাকি।

দশটায় হাজিরা হলেও কলকাতার সেক্রেটারীয়েটে সাড়ে দশটা-এগারোটার আগে বড় একটা কেউ আসেন না। কেউ কেউ আবার তারও পরে আসেন। প্রথম প্রথম দিল্লী থেকে রাইটার্স বিল্ডিংসে পোস্টিং নিয়ে আসার পর এ-রকম হাজিরার বহর দেখে অরুন্ধতীর অবাকই লাগত। কিন্তু এখন তাঁর আর অবাক লাগে না। এখানকার এটাই নাকি নিয়ম। এটাই ট্র্যাডিশন। কবে থেকে এ ট্র্যাডিশন চলে আসছে অরুন্ধতীর জানা নেই। তবে যেদিন এক পুণ্যলগ্নে ইংরেজ লাটসাহেব এ দেশের শাসনভার এ দেশের লোকদের হাতে তুলে দিল, যেদিন রাইটার্স বিল্ডিংসে অবিভক্ত বাংলার প্রথম শাসনভার হাতে নিয়ে বসলেন ফজলুল হক সাহেব, সেদিন থেকেই বোধহয় এ প্রথা চলে আসছে। কিংবা তারও অনেক অনেক আগে স্যার অ্যাসলি ইডেনের সময় যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির করণিকদের জন্য এই বড় লাল বাড়িটায় সারি সারি ঘর তৈরি হল—সেদিন থেকে।

অরুন্ধতী ভাবলেন, সেই রাইটার্স বিল্ডিংসের কতবার হাত-বদল হয়েছে, কত রাজনৈতিক দল এসেছে গিয়েছে, সেক্রেটারীয়েটের চেহারা কিন্তু বড় একটা বদলায়নি। যে-কে-সেই।

অরুন্ধতী নিজে এই সেক্রেটারীয়েটকে প্রায় গোটা এক যুগ ধরে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। ডাঃ বি সি রায় যখন চীফ মিনিস্টার, ওঁর বাবা তখন ওয়েস্ট বেঙ্গলের চীফ সেক্রেটারী। তারপরও বেশ কয়েকবার শাসনযন্ত্রে পালাবদল হয়েছে, দু-দুবার রাষ্ট্রপতি শাসন হয়েছে, বিরোধী দলের ফ্রন্ট সরকার হয়েছে, দু-দু' দফায় মিনি কোয়ালিশন সরকার বছর খানেক রাজত্ব করেছে। মাঝে-মধ্যে কলকাতা এলে সে সময়কার মহাকরণের চেহারা তিনি নিজেই দেখেছেন। কিছু কিছু আবার শুনেছেনও। এই মাস

চারেক হল দিল্লী থেকে বদলি হয়ে আসার পরও সেই একই চেহারা দেখছেন। যে যখন খুশি আপিসে আসছে, যাচ্ছে। কাজকর্ম ফেলে আপিস-আওয়ার্সেই দপ্তরে বসে শ্লোগান দিচ্ছে, অফিসারদের ঘেরাও করছে। যারা কাজ করতে চাইছে, সহকর্মীরাই তাদের গায়ে কালি ছিটিয়ে দিচ্ছে। থুতু দিচ্ছে। দপ্তরে দপ্তরে ফাইল দিনের পর দিন পড়ে থাকছে। তাতে ধুলো জমছে। অফিসাররা জরুরী ফাইল তলব করে পান না। বেয়ারারা দপ্তর ঘুরে এসে বলে, কাজ বন্ধ্। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। দিল্লীর সেক্রেটারীয়েটে অরুন্ধতীর এ জিনিসটা বড় একটা চোখে পড়েনি।

অরুন্ধতী ভেবে দেখলেন, একটু আগেই নীচে লিফটে ওঠার মুখে আপিসের ভেতরে ক্যান্টিন হলের কাছ থেকে তিনি শ্লোগান শুনেছেন—এ আদেশ মানি না, মানছি না, বরখাস্ত নোটিস তুলে নাও, তুলে নাও, গভর্নর গো ব্যাক, গো ব্যাক! কিন্তু আগের দিন, কর্মচারীদের উপর ডিসমিশাল নোটিস সার্ভ হবার সময় অরুন্ধতী ঠিক যতটা এজিটেশন আশঙ্কা করেছিলেন, আজকের এজিটেশনের চেহারা ঠিক ততটা নয়। আপিসে ঢোকার মুখেই তিনি তা বুঝে নিয়েছিলেন। অরুন্ধতী কিন্তু নিজে ঠিক এতটা, এই একসঙ্গে তিনশো এগারোয় তেরোজন কর্মীর ছাঁটাই আশা করেননি। এই দুর্দিনে এই চাকরী যাওয়ার ব্যাপারটা নিজেরই যেন কী রকম লাগে। তবে এ ব্যাপারে এই রাইটাসে ডিসিপ্লিন-ডেকোরাম ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কিছু একটা হোক, তিনি চেয়েছিলেন। আর এই রাষ্ট্রপতি শাসনে তা না হলে যে আর কোনদিনও হবে না, সেটা অরুন্ধতী বুঝেই নিয়েছিলেন।

চেম্বারে প্রবেশ করার আগে অরুন্ধতী নিজের দপ্তরটা একবার ঘুরে গেলেন। রোজই তিনি নিজের ঘরে যাবার আগে দপ্তরটা হয়ে যান। কর্মী উপস্থিতির হার নিজেই পরখ করে নেন। আজ কিন্তু দেখলেন, উপস্থিতির হার বেশ ভালই। সকলেই যে যার চেয়ারে বসে, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। বললেও, বলছে চাপা

স্বরে, আস্তে আস্তে। গোটা দপ্তরেই একটা চাপা উত্তেজনা। উত্তেজনাটা যেন গোটা মহাকরণেই। দূর থেকে তখনও অস্পষ্ট শ্লোগান ভেসে আসছে—আমাদের দাবী মানতে হবে, মানতে হবে। কর্মচারী ঐক্য জিন্দাবাদ। এ আদেশ প্রত্যাহার কর, প্রত্যাহার কর। আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে।

বনমালী সুইং-ডোর টেনে ধরতেই অরুন্ধতী তাঁর এয়ার-কণ্ডিশান চেম্বারে প্রবেশ করলেন। টেবিলের উপর সানগ্লাসটা খুলে রেখে অ্যাটাচড্ ক্লোকরুমে গিয়ে ঢুকলেন। দেওয়াল-আয়নায় নিজের চেহারাটা ফুটে উঠতেই একবার মুখ টিপে হাসলেন। ভাবলেন, ছোকরা আই এ এস, আই পি এস অফিসাররা সব যে তাঁর পেছনে ঘোরাফেরা করে তা তবে একেবারে অহেতুক নয়। এরই মধ্যে বনমালী যথাস্থানে ব্রিফ-কেস, টিফিন-ক্যারিয়ার এবং জলের ফ্লাস্ক রেখে তার দপ্তরে চলে গিয়েছে। রিভলভিং চেয়ারে বসে অরুন্ধতী ব্রিফ-কেস খুলে তাঁর ছোট এ্যাটাচিটা বের করে নিলেন। তারপর ভেতর থেকে ছোট আরশি টেনে নিয়ে সামনে ধরে অন্যহাতে লিপস্টিক স্টিকটা আলতো করে ঠোঁটের উপর বোলাতে লাগলেন। এরই মধ্যে টেবিলে রাখা টেলিফোনের রিং বেজে উঠল। ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষতে ঘষতেই রিসিভার তুলে নিলেন তিনি—'ইয়েস অরুন্ধতী সেন স্পিকিং।'

ওপাশ থেকে অরুন্ধতী সেনের পি-এ ভারী গলায় জানাল. 'ম্যাডাম, গভর্নরের সেক্রেটারী।' তারপরই লাইনটা খটাস করে ডাইরেক্ট করে দিলেন।

'গুড মর্নিং মিঃ লাহিড়ী', অরুন্ধতী গভর্নরের সেক্রেটারীর সঙ্গে হৃদ্যতা বিনিময় করলেন।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে গভর্নরের সেক্রেটারী জিজ্ঞেস করলেন—'রাইটার্সের কী খবর ?'

অরুন্ধতী বললেন—'মোটামুটি পিসফুল। তবে শুনেছি ওরা পিল্ল-ওয়ার্ক করছে। কী সব মিছিল-টিছিলও নাকি করবে।'

গভর্নরের সেক্রেটারী বললেন—'ঠিক আছে, খবর-টবর হলে জানাবেন। অবশ্য হিজ এক্সেলেনসির সঙ্গে চীফ সেক্রেটারীর কথা হয়েছে। উনিও টাচ-এ রয়েছেন। হ্যাঁ, শুনুন মিস সেন, ভুটানের মহারাজার ট্যুর প্রোগ্রামটা এখনও কিন্তু পাইনি। যদি পারেন আজই পাঠিয়ে দেবেন, কালই হিজ এক্সেলেন্সীর কাছে প্লেস করব।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে রাখতেই অরুন্ধতী আপন মনে হাসলেন। এইসব রাজা-মহারাজাদের এ রাজ্যে পদার্পণ ঘটলে রাজভবনের সকলের বেশ একটু উৎসাহী খুশি-খুশি ভাব দেখা যায়। তার কারণও অরুন্ধতী সেনের অজানা নয়। এই রাজভবনেরই একটা মানুষের অনেক কাছে তিনি কিছুদিন থেকেছেন। অনেক কাছে থেকে রাজভবনকে দেখেছেন। এইসব রাজা-মহারাজারা যখন আসেন, এই রাজভবনেই ভি আই পি হয়ে থাকেন। ওঁদের প্রোগ্রামও থাকে সাধারণতঃ মামুলি ধরনের। ওঁরা দু-তিনদিন বেশ ফূর্তিতে কাটান। তারপর দেশে ফেরার আগে রাজভবনের কর্মচারীদের বড় রকমের সব গিফ্‌ট্‌ দিয়ে যান। নিজেদের দেশের সব মূল্যবান রেয়ার জিনিস। সোনা-দানা মুক্তো জহরত আসবাবপত্র কাপড়-চোপড় মায় হুইস্কির বোতল পর্যন্ত। সব টোকেন অফ লাভ।

পোস্টিং অনুযায়ী এই ভি আই পি-র ট্যুর প্রোগ্রাম করার কথা অরুন্ধতীর নয়। এ সব করবেন আণ্ডার সেক্রেটারী ফর হোম অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ারস্‌। কিন্তু আণ্ডার সেক্রেটারী হোম হঠাৎ স্মল অ্যাণ্ড কটেজ ইণ্ডাস্ট্রির জয়েন্ট ডাইরেক্টর হয়ে বদলি হয়ে যাওয়ায় চীফ সেক্রেটারীর নির্দেশে জয়েন্ট সেক্রেটারী ফর হোম অরুন্ধতী সেনকে ওই কাজ দেখাশোনা করতে হচ্ছে।

টেবিলের উপর এনগেজমেন্ট ক্যালেণ্ডারে আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট রোসটারটা একবার দেখে নিলেন অরুন্ধতী। সাড়ে এগারোটায় তিনি ডি আই জি, আই বি এবং ডি সি, এস বি ওয়ানকে তাঁর

ঘরে ডেকেছেন। মহারাজার সিকিউরিটি ব্যবস্থা পাকা করে নেবেন। মহারাজা দু-দিন রাজভবনে থাকবেন। দুটো একজিবিশান ওপেন করবেন। একটা ধর্মসভায় ভাষণ দেবেন। শহরের গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাজভবনে এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করবেন। কলকাতার ভুটান সরকারের হাই-কমিশন আপিসে এক অনুষ্ঠানে ভুটানের পক্ষ থেকে পরিচালক সত্যজিৎ রায় এবং অভিনেত্রী মাধবী চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জানাবেন। ওই অনুষ্ঠানেরই অঙ্গস্বরূপ ভুটানিজ ভাষায় ডাব করা 'পথের পাঁচালী'র প্রোজেকশন দেখবেন। দেশে ফেরার আগে অবশ্য সল্ট লেক এরিয়ায় তিনি শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করবেন। বাংলাদেশ মিশনে মিশনের প্রধান এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্বীকৃতির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবেন। সে সময় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব।

অরুন্ধতী ভাবলেন, ল অ্যাণ্ড অর্ডার সংক্রান্ত উইকলি রিপোর্টটা আজই দিল্লী পাঠিয়ে দেবেন। দু-দিন আগেই ডিউ ডেট পেরিয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট রুলসে এই একটা বাড়তি কাজ, সপ্তাহে সপ্তাহে দিল্লীতে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠানো, অরুন্ধতীকে করতে হচ্ছে। আগে মাসে একবার করে সেই রিপোর্ট পাঠালেই চলত। কিন্তু এখন দিল্লীর নির্দেশ—না, তা হবে না। প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট পাঠাও। প্রধানমন্ত্রী নিজে এখন হোম দেখছেন। পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে কনসার্নড্। অথচ অরুন্ধতী নিজে জানেন, দিল্লীর সেক্রেটারীয়েটে ক্লার্কদের জিম্মায় দিনের পর দিন কী ভাবে ওই সব রিপোর্ট পড়ে থাকে। কেউ বড় একটা খুলেও দেখেন না।

অরুন্ধতী ইন্টারকমে চীফ সেক্রেটারীর নাম্বার ডায়াল করলেন। কয়েকবার রিং হয়ে যেতেই রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। চীফ সেক্রেটারী ঘরে নেই। ভাবলেন, হয় মিটিং-রুমে না হয় রাজভবনে। সাধারণতঃ লাঞ্চের আগেই চীফ সেক্রেটারী অফিসিয়াল মিটিং-ফিটিং

সেরে রাখেন। বিকেলের দিকে ফাইলপত্র দেখেন। ভিজিটার্সদের মিট করেন। এরই মধ্যে আবার প্রায়ই তাঁকে রাজভবনে ছুটতে হয়।

ইচ্ছে করেই অরুন্ধতী নিজে বড় একটা এনগেজমেন্ট রাখেননি। মনে পড়ল রাত্রে দিব্যেন্দুকে ডিনারে ডেকেছেন। তিনটে নাগাত নিজেই একবার ফোন করে আই জি-র সঙ্গে দেখা করবেন। সুব্রত সম্পর্কে পরামর্শ করবেন। বড়দির একমাত্র ছেলে সুব্রত, প্রেসিডেন্সীতে ফার্স্ট ইয়ার সায়েন্সে ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে পড়ে। লেখাপড়ায় ভাল। হায়ার সেকেণ্ডারীতে থার্ড প্লেস পেয়েছিল। কিছুদিন হল ওর চলাফেরা মতিগতির কেউ ঠিক-ঠিকানা রাখতে পারে না। রাত করে বাড়ি ফেরে। কোনদিন আবার ফেরেও না। কোথায় যায়, কী করে বাড়ির কাউকে কিছু বলে না। ওর সহপাঠী বন্ধুরা বলে, ও নাকি নকশাল হয়ে গিয়েছে। নকশাল নেতার সঙ্গে ওকে কেউ কেউ নাকি ঘুরতেও দেখেছে। অরুন্ধতীর মনে পড়ল এখানে এসে ওদের গড়িয়াহাট রোডের বাড়িতে বার কয়েক গিয়েছিলেন। কিন্তু একবারও সুব্রতর দেখা পাননি। ইচ্ছে করেই যেন সুব্রত তাঁকে এড়িয়ে গেছে। অথচ এই সুব্রত যখন আরও ছোট ছিল, মাসীমণি বলতেই অজ্ঞান। গেল বছরও তো দিল্লীতে তাঁর বাড়িতে ও কিছুদিন হৈ-হুল্লোড় করে কাটিয়ে এসেছিল।

অরুন্ধতী পুশ-বাটন টিপে পি এ-কে ডাকলেন। রাইটার্সের ভিতরের অবস্থা জানতে চাইলেন। ছোট ছোট দুটো ডিকটেশন দিলেন। একটা হোম সেক্রেটারীকে, অপরটা ফিনান্সের ডেপুটি সেক্রেটারীকে। কয়েকটা ফাইল সই করলেন। একটা জরুরী ফাইল তলব করলেন। কিন্তু একটু বাদেই পি-এ দপ্তর ঘুরে এসে জানালেন, দপ্তরে কেউ কাজ করছে না। হেড-অ্যাসিস্ট্যান্ট

ঘরে নেই। আজ আর ফাইল মুভ করবে না। অরুন্ধতী একবার ভ্রূ কোঁচকালেন। কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেলেন। বনমালীকে ডেকে পাখাটার স্পিড বাড়িয়ে নিলেন। তারপর নিজের হাতেই ফ্লাস্ক থেকে একটু জল গড়িয়ে খেলেন।

এই ফ্লাস্ক থেকে জল ঢালতে গিয়ে অরুন্ধতীর ছোট্ট একটা অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। তিনি তখন দিল্লীতে এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির ডেপুটি সেক্রেটারী। তাঁদের ডিপার্টমেন্টের জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রীবাস্তবের ঘরে একটা মিটিংয়ে একদিন তাঁকেও ডাকা হয়েছিল। প্রায় একটানা দেড় ঘণ্টা মিটিং চলাকালে শ্রীবাস্তব সাহেবকে তিনি নিজের হাতে ফ্লাস্ক থেকে গুণে চার বার জল ঢেলে খেতে দেখেছিলেন। ব্যাপারটা তাঁর চোখে কেমন যেন ঠেকেছিল। যাঁর নিজের চার চারটে বেয়ারা-আর্দালি তাঁকে সারাক্ষণ সার্ভ করার জন্য তৈরি, তিনি নিজেই নিজের হাতে জল গড়িয়ে খাচ্ছেন। পরে মিটিং-শেষে এক প্রবীণ সহকর্মীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে তিনি হো হো করে হেসে উঠেছিলেন—'মাই গড, তুমি এখনও জান না?' তিনিই অরুন্ধতীকে বুঝিয়েছিলেন—ফ্লাস্কে জল নামক যে বস্তুটি থাকে তা হল 'লেম্বু-পানি' যার আসল নাম, লাইম-জিন। কেউ কেউ আবার কোকাকোলা মিশিয়ে রামও রাখেন। পরে অরুন্ধতী দেখেছিলেন দিল্লীর সেক্রেটারীয়েটের হোমরা-চোমরা প্রায় সব অফিসাররাই নিজেদের কাছে ফ্লাস্ক রাখেন। আর তাঁদের দেখলেই অরুন্ধতীর শ্রীবাস্তব সাহেবের কথা মনে পড়ে যেত। কলকাতার সেক্রেটারীয়েটে অফিসারদের মধ্যে এ রেওয়াজ চালু হয়েছে কিনা তা অবশ্য অরুন্ধতীর জানা নেই।

ডি আই জি, আই বি এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার মিটিং শেষে অরুন্ধতীর ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই অরুন্ধতী বেল বাজিয়ে বনমালীকে ডাকলেন, লাঞ্চ সার্ভ করতে বললেন।

একবার সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকলেন। সোপ-ওয়াটারে হাত ভাল করে ধুয়ে নিলেন। তারপর ছোট একটা ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে আবার চেয়ারে এসে বসলেন। বনমালী টেবিলে লাঞ্চ সাজিয়ে দরজা লক করে বাইরে চলে গেল। লাঞ্চ মানে, গোটা ছুয়েক ফিসফ্রাই, ছুটো চিকেন স্যানডুইচ, হরিণঘাটার ছুধে কাটানো কিছুটা ছানা এবং গাঙ্গুরামের ছুটো সন্দেশ। আপিসে আসার আগে অরুন্ধতী হেভি ব্রেকফাস্ট করে আসেন। লাঞ্চে তিনি ড্রাই ফুডই বেশি পছন্দ করেন।

স্যানডুইচে কামড় দিতে দিতে অরুন্ধতী ভেবে দেখলেন, এই ক-মাসে দিল্লী থেকে পোস্টিং নিয়ে আসার পর তিনি নিজেই নিজের অজ্ঞাতে কী ভাবে সেক্রেটারীয়েটের অফিসিয়াল পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়েছেন। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা পোস্টে থাকা মানেই বুঝি অফিসিয়াল পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়া। দিল্লীর মত এখানেও যে অফিসারদের ছুটো বড় দল রয়েছে তা অবশ্য অরুন্ধতী এসেই ক'দিনে টের পেয়েছিলেন। বাকিটা শুনেছিলেন দিব্যেন্দু দত্তর মুখে। চীফ সেক্রেটারী সব্যসাচী বসু, আই জি ভবানন্দ চ্যাটার্জি, জুডিশিয়াল সেক্রেটারী সুকুমার দত্ত, ফিনান্স কমিশনার অলোক বাগচী, এঁদের একটা দল। যাঁদের মধ্যে প্রবীণ আই সি এস, আই এ এস থেকে উঠতি, সবে সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন এমন আই এ এস, আই পি এস অফিসাররাও রয়েছেন। আর অন্যদিকে রয়েছেন মেম্বার বোর্ড অফ রেভিন্যু ব্রজমাধব বিশ্বাস, হোম সেক্রেটারী অংশুমান রায়, ট্রান্সপোর্ট কমিশনার কংস চাকলা-দার, ইত্যাদি আরও অনেকে। প্রথম দলে যাঁরা আছেন তাঁরা চাকরী মানেই বোঝেন ডিউটি। আর ডিউটি ইজ স্যাংটিটি। তাঁরা কাজ জানেন ভাল, বোঝেনও ভাল। তবে এঁরা বেশির ভাগ লোকই বড় খুঁতখুঁতে। আর তোষামোদও বড় বেশি পছন্দ করেন। অপর দলে যাঁরা আছেন তাঁরা কিন্তু নিজেরা কাজ করেন কম। অপরদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবারই বেশি

পক্ষপাতী। তাঁদের কাছে কাজ মানে একটা স্পোর্টস। আইনে পারমিট করে না এমন কাজও তাঁরা মাঝে-মধ্যে করে থাকেন। আপিসের বাইরেও এঁরা অফিসকে নিয়ে যান। পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁয় কিংবা বাড়িতে ড্রিঙ্কসের টেবিলে এঁরা মিসেসদের সঙ্গে অফিসিয়াল পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করেন। এঁদের কেউ কেউ আপিস-ফেরতা বিশেষ জায়গায় অবসর কাটিয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরেন। বলা বাহুল্য, আগের দলই এখন মহাকরণের পাওয়ারফুল গ্রুপ। অথচ, এই সেদিনও কোয়ালিশন সরকারের আমলে দ্বিতীয় দলের লোকেরাই গোটা মহাকরণে রাজত্ব করেছে। অরুন্ধতী বুঝতে পারছিলেন তিনি আস্তে আস্তে নিজেকে প্রথম দলের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলছিলেন। কিন্তু দিব্যেন্দু, দিব্যেন্দু দত্ত কোন দলের?

দিব্যেন্দুর কথা মনে হতেই অরুন্ধতী রিসিভার তুলে পি এ-কে নিউ সেক্রেটারীয়েটে লাইন দিতে বললেন। কিন্তু পি-এ জানালেন, কেউ টেলিফোন ধরছে না। এক্সচেঞ্জ ওয়ার্ক করছে না।

অরুন্ধতী যখন সন্ধ্যাবেলা বাইরের ঘরে বসে টাইম ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিলেন, বাইরে কলিং-বেল বেজে উঠল। অরুন্ধতী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন সাতটা বেজে পনেরো। বুঝলেন দিব্যেন্দু দত্ত এলেন। আধ ঘণ্টাও হয়নি অরুন্ধতী আপিস থেকে এসেছেন। জামাকাপড় ছেড়েছেন। শাওয়ার খুলে ভাল করে স্নান করেছেন। (এই সন্ধ্যাবেলা স্নান করাটা অরুন্ধতীর অনেক-দিনের অভ্যাস।) ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে সাধারণ মেক-আপ নিয়েছেন। মুখে একটু ক্রিম ঘষেছেন। পাউডারের পাফটা আলতো করে গলায় গালে বুলিয়েছেন। ঠোঁটে পাতলা করে লিপস্টিক লাগিয়েছেন। গোলাপী রংয়ের ছাপাশাড়ি পরেছেন। গায়ে হাত-কাটা ছোট ব্লাউজ, লুজ করে বডিস বাঁধা। স্লিপার পায়ে নীচে নেমে এসেছেন। তারপর বাইরের ঘরে বসেছেন দিব্যেন্দুর আসার অপেক্ষায়।

দিব্যেন্দু দত্ত ঘরে ঢুকলেন। ওঁর গায়ে নীল স্পোর্টস টেরিলিন গেঞ্জি। সাদা প্যাণ্ট। পায়ে স্ট্র্যাপ দেওয়া সাণ্ডাল। ওঁর হাতে ক্যাপস্টানের টিন, রনসনের লাইটার। ফরসা দুই গাল বেয়ে নেমে এসেছে বড় বড় ঝুলপি। ছিমছাম দোহারা গড়নের ওঁর চেহারার সঙ্গে বাংলা ছবির সৌমিত্র চ্যাটার্জির অনেকটা আদল রয়েছে। অরুন্ধতী ওঁর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন।

রিটায়ার্ড আই সি এস অফিসার শতদল সেন তখনও সান্ধ্যভ্রমণ সেরে ফেরেননি। অবসর নেবার পর রোজ সকাল-বিকাল গোটা লেকের চৌহদ্দিটুকু দু-দুবার করে পায়ে হেঁটে উনি ঘোরেন। আজ পাঁচ বছরের উপর হয়ে গেল এ অভ্যাস তিনি নিয়মিত চালু রেখেছেন। এতে তাঁর শরীরের বাঁধনটা মোটামুটি একই রকম আছে। হজমও ভাল হয়। তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী আরও

পাঁচজন রিটায়ার্ড অফিসার। ইনকাম-ট্যাক্সের কমিশনার মিঃ দত্তগুপ্ত, জাস্টিস তারাপদ দাশ, মোহনবাগানের ডি ধর, আরও অনেকে। জাস্টিস দাশ এই সেদিন সকালবেলা বেড়িয়ে ফেরবার পথে রাস্তায় ছুরিকাহত হলেন। তারপর থেকে শতদল সেন সকালের দিকে বড় একটা বেরোন না।

অরুন্ধতী দিব্যেন্দু দত্তকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠিয়ে নিয়ে এলেন। বারান্দা পার হতে গিয়ে দিব্যেন্দু দেওয়ালের গায়ে একটি মহিলার বড় একটা অয়েলপেন্টিং দেখলেন। তাতে রজনীগন্ধার মালা পরানো। না বললেও দিব্যেন্দু বুঝলেন ইনিই অরুন্ধতীর মা। মাত্র বছর দুই হল মারা গিয়েছেন।

বারান্দা পেরিয়ে ওঁরা দোতলায় যে ঘরটার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন, দিব্যেন্দু দেখতে পেলেন, তাতে ছোট একটা রঙ লাইট জ্বালানো। তার হাল্কা আলো সারা ঘরটায় ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরের এক কোণে ডবল বেডের খাট পাতা, তাতে ডানলোপিলো গদির উপর সাদা চাদর বিছানো। ধারেই একটা ছোট টেবিলের উপর ফ্লাওয়ারভাসে রজনীগন্ধার স্টিক। খাটের স্ট্যাণ্ডের গায়ে বেড-লাইট। দেওয়ালের ওপাশের ধার ঘেঁষে পর পর চারটে একই সাইজের কাঁচের আলমারি। সব ক'টাতেই ইংরাজী বই ঠাসা। শুধু একটাতে কিছু বাংলা বই, সবই প্রায় রবীন্দ্র-রচনাবলী। আলমারির সারি যেখানে শেষ, সেখানে ঘরের কোণে জানলার মুখোমুখি বড় একটা সেক্রেটারীয়েট টেবিল, পুরোটা কাঁচে ঢাকা। সামনে চেয়ার পাতা। টেবিলের উপর একটা ল্যাম্প, পেন-কেসে দুটো বল-পেন বসানো। পাশেই গোটাকয়েক আপিস ফাইল। লাল ছাপানো 'সিক্রেট' শ্লিপ লাগানো। ঘরের অন্যদিকে একটা গোল টেবিল, টেবিলের চারধারে চারটে প্লাস্টিক বেতের গোল চেয়ার। টেবিলে অ্যাশট্রে। ঘরের চারদিকে দেওয়ালের গায়ে রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়ার এবং মহাত্মা গান্ধীর ছবি টাঙানো। রিটায়ার্ড চীফ সেক্রেটারী শতদল সেনের কতকগুলি প্রোফাইল ছবি, সবই গ্রুপ

ফটো। কোনটায় নেহরুর সঙ্গে দমদম এয়ারপোর্টে, কোনটায় ডাঃ রায়ের সঙ্গে হরিণঘাটায়, কোনটায় তাঁর চেম্বারে। অপর একটায় তিনি বুলগানিন এবং ক্রুশ্চেভের মাঝখানে। একদিকে অরুন্ধতীর একটা ছোটবেলাকার ছবি, তাঁর বাবা-মা'র মাঝখানে ফ্রক-পরা অবস্থায়। ঘরের মাঝ-বরাবর দেওয়ালের ধার ঘেঁষে ওয়ার্ডরোব, একটা আলনা। আলনার উপর দুটো ব্লাউজ, একটা বডিস মেলা।

'আমরা বারান্দায় গিয়েই বসি'—বলে অরুন্ধতী দিব্যেন্দুকে প্যাসেজের পাশ দিয়ে বারান্দায় নিয়ে এলেন। ঘরের পাশের সংলগ্ন ব্যালকনিটা একেবারে রাস্তার ধারে। যেখান থেকে লেক স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। বারান্দার দেয়ালের গায়ে টবে কয়েকটা পাতাবাহার গাছের ঝাড়, একটাতে ছোট নীল ফুল ধরে রয়েছে। মানিপ্ল্যাণ্ট দেওয়ালের এদিক-ওদিক লতিয়ে উঠেছে। বারান্দার একদিকে একটা ছোট বেতের টেবিল, গোটাকয়েক চেয়ার পাতা। দেওয়ালে মাথার উপর ছোট ডুম লাইট, অল্প পাওয়ারের। অরুন্ধতী এবং দিব্যেন্দু দুটো চেয়ার দখল করে বসলেন।

একটু পরেই বেয়ারা ট্রে করে কয়েকটা খালি গ্লাস, কিছু পটেটো চীপস, প্লাস্টিকের বালতিতে কিছু ফ্রিজের বরফ, ড্রিংকসের বোতল রেখে চলে গেল। অরুন্ধতী নিজের হাতে দিব্যেন্দুর গ্লাসে হুইস্কি-সোডা ঢেলে দিলেন। নিজে বেশি সোডা দিয়ে একটু লাইম-জিন নিলেন। তাতে বরফের কুচি ফেলে দিলেন।

গ্লাসে সিপ করতে করতে অরুন্ধতী জিজ্ঞেস করলেন—'তারপর দিব্যেন্দু, তুমি কী ছুটির দরখাস্ত দিয়ে দিয়েছ?'

দিব্যেন্দু বললেন—'না, তবে সেক্রেটারীকে মুখে বলে রেখেছি। ভাবছি পনেরো তারিখ থেকেই মাসখানেকের লিভে যাব। লক্ষ্ণৌ ঘুরে আসব। এ ভাবে টেনশনের মধ্যে কাজ করতে ভাল লাগছে না।'

অরুন্ধতী কিন্তু এবার দিব্যেন্দুর কথার কোন জবাব দিলেন না। দিব্যেন্দুর এই টেনশনের কথা তিনি জানেন। হঠাৎ একদিনের

নোটিসে রাইটার্স থেকে নিউ সেক্রেটারীয়েটে তাঁর বদলি হবার পর থেকেই দিব্যেন্দু কী রকম আপসেট হয়ে পড়েছে। তাঁর এই হঠাৎ বদলির ব্যাপারটাকে সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে গভর্নমেন্টের এক রকম সেনসরসিপ বলে ধরে নিয়েছিলেন। এ নিয়ে তাঁর কলিগরাও তাকে টিজ করতে ছাড়েনি।

অরুন্ধতী নিজেও কম টেনশনের মধ্যে নেই। এখানে পোস্টিং নিয়ে আসার পর কাজ করতে গিয়ে ছুটো ব্যাপারে অরুন্ধতী নিজেকে যে রকম ইনভলভড্ করে ফেলেছেন, তাতে শুধু তার স্ট্রেনই বাড়েনি, টেনশনও কম যাচ্ছে না। তবে অফিসিয়াল পলিটিক্সের চেয়ে যে ব্যাপারটা তাঁর কাছে বড় অ্যাফেয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হল স্টেটের ল অ্যাণ্ড অর্ডার প্রবলেম। এখানে-সেখানে প্রতিদিন খুনোখুনি লেগেই আছে। পুলিস মরছে, নকশাল মরছে, কংগ্রেস মরছে, সি পি এম মরছে। লাঠিসোঁটা নয়, এখন বন্দুকে বন্দুকে, রাইফেলে রাইফেলে পাড়ায় পাড়ায় লড়াই হচ্ছে। পুলিসের মতই পার্টিগুলির হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। অরুন্ধতী ভেবে দেখলেন, গেল ছু'মাসেই শুধু কলকাতাতেই একত্রিশ জন পুলিস কনস্টেবল হয় পাইপগান, না হয় ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন। তেরোটা বন্দুক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। একজন জওয়ান এবং চারজন সাধারণ মানুষকে পুলিসের ইনফরমার সন্দেহে দিনের বেলায়ই পিটিয়ে মারা হয়েছে। অরুন্ধতী শুনেছেন কাশীপুর দমদম টালিগঞ্জ যাদবপুরে এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে নাকি পুলিসই ঢুকতে এখনও ভয় পায়।

একটু পরেই ওঁরা রাস্তা দিয়ে শতদল সেনকে ফিরতে দেখতে পেলেন। ওঁর গায়ে গলাবন্ধ গেঞ্জি, হাফ-প্যান্ট। পায়ে কেডস, সাদা মোজা। হাতে স্টিক। স্টিক ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলেন। বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দিব্যেন্দু উঠে দাঁড়ালেন—'গুড ইভনিং স্যার।'

'ওয়েল, ক্যারি অন মাই বয়। এক্সকিউজ মি ফর এ মিনিট'

—শতদল সেন শিস দিতে দিতে নিজের ঘরে ঢুকলেন এবং একটু বাদেই পা-জামা, গায়ে পাঞ্জাবী, পায়ে স্লিপার গলিয়ে ওদের মাঝে ফিরে এলেন। ওঁর ডান হাতের দু-আঙুলের মাঝখানে একটি জ্বলন্ত চুরুট।

খালি একটা চেয়ারে বসতে বসতে রিটায়ার্ড আই সি এস শতদল সেন বললেন—'ওয়েল, এবার বল রাইটার্সের খবর কী? বিপ্লব কতদূর এগোল?'

অরুন্ধতী একটা গ্লাসে একটু হুইস্কি, বেশি সোডা মিশিয়ে শতদল সেনের দিকে এগিয়ে দিলেন। 'থ্যাঙ্কস্' বলে মিঃ সেন ধীরে ধীরে হুইস্কির গ্লাসে সিপ করতে লাগলেন।

'ওয়েল, আই মাস্ট্ কনগ্র্যাচুলেট ইওর চীফ সেক্রেটারী সব্যসাচী বোস। হি হ্যাজ টেকেন এ রাইট স্ট্যাণ্ড এট দ্য রাইট মোমেণ্ট। রাইটার্সের হিষ্ট্রিতে একটা রেভ্যলিউসন, কী বলো?' দাঁতে চুরুট চাপতে চাপতে শতদল সেন কথাগুলো বলে গেলেন। অরুন্ধতী এবং দিব্যেন্দু ওঁরা দুজনেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'ইউ মাসট নো দিব্যেন্দু, ওয়ানস আই সাজেসটেড টু দি দেন সি এম টু টেক সিমিলার অ্যাকশান এগেনস্ট ইনডিসিপ্লিন্ড্ এমপ্লয়িজ। কিন্তু কিছু হয়নি। কেউই রাজী হননি। দশটা পার্টির দশজন মন্ত্রীই সেদিন একযোগে বলেছেন—ও নো। তাঁরা কী বলেছিলেন জান? আমাদের আবার ইলেকশন ফেস করতে হবে না? পাবলিকের কাছে ভোট চাইব কী বলে? অথচ সেদিন একজন দুজনের এগেনস্টে যে অ্যাকশন নিলে কাজ হতো, আজ এত জনের বিরুদ্ধে সে অ্যাকশন নিতে হল। অল ননসেন্স।'

এরই মধ্যে দিব্যেন্দুর গ্লাসে আর এক পেগ হুইস্কি ঢেলে দিয়েছেন অরুন্ধতী। নিজেও একটু সোডা ঢেলে নিয়েছেন।

'জান, ডাঃ রায়কেও দেখেছি, আর তোমাদের সব অন্য মন্ত্রীদেরও দেখেছি। হেভেন এণ্ড হেল ডিফারেন্স। ডাঃ রায় কিন্তু কখনই

এসব ইনডিসিপ্লিন বরদাস্ত করতেন না। একবার হল কী, কমার্স ডিপার্টমেন্টের এক হেড ক্লার্ক, সে আবার ইউনিয়নের পাণ্ডা, প্রায়ই দেরী করে আপিসে আসত। ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী স্ট্রিকচার দেওয়া সত্ত্বেও সে আপিসে নিয়মিতই লেট করে অ্যাটেণ্ড করত। একদিন সেক্রেটারী ওর বিরুদ্ধে কড়া নোট লিখে ফাইল আমার কাছে পাঠালেন। আমিও যথারীতি সে নোট ডাঃ রায়ের কাছে প্লেস করলাম। সব দেখেশুনে ডাঃ রায় তো রেগে একশেষ। ক্লার্ককে ডাকলেন। ওর সামনেই আমাকে বললেন, আসছে মাস থেকে ওর স্যালারি থেকে ত্রিশ টাকা কাট করে নিতে। ক্লার্কটি কিছু বলতে যাচ্ছিল। ডাঃ রায় ধমক দিয়ে উঠলেন। সেদিনই ওর নামে যথারীতি অর্ডার বেরিয়ে গেল। তা আবার ডিপার্টমেন্টে ডিপার্টমেন্টে ঘোরানো হল। কিন্তু সাতদিনের দিনই যখন দেখা গেল লোকটি ঠিক টাইমে আপিসে আসছে, যাচ্ছে, ডাঃ রায়ের স্পেশাল অর্ডারে তার দশটাকা স্পেশাল পে বাড়িয়ে দেওয়া হল।

'আর একদিন হল কী, ফিনান্স থেকে একটা সারকুলার বেরোল। সে সারকুলার ডাঃ রায়ের হাতে পড়তেই তিনি আমাকে তলব করলেন। বললেন, দেখ সেন, তোমার ফিনান্স সেক্রেটারীর ইংরাজী। সেই সারকুলারের দু-জায়গায় টেন্সের ভুল ছিল। ফিনান্স সেক্রেটারীকে ডেকে ধমকে দিলেন। আর যে ডেপুটি সেক্রেটারী সারকুলার ড্রাফট করেছিলেন, তাঁর চাকরীতে রিভারসন হয়ে গেল। যদিও স্যালারি একই রইল। ক্যান ইউ ইমাজিন দিস টু-ডে?' একটানা কথাগুলি বলে গেলেন মিঃ সেন।

শতদল সেন কিন্তু আর বেশিক্ষণ বসলেন না। কথা বলতে বলতে এক সময় উঠে পড়লেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আই অ্যাম অ্যাফ্রেড আই মে বী লেট টু স্লিপ টু-ডে। এনিওয়ে, তোমরা কিন্তু ঠিক সময় ডিনার খেয়ে নিও।'

রিটায়ার করার পর থেকে শতদল সেন রাতে ঠিক ন'টায়

শুতে যান। সাপার করেন এক স্লাইস রুটি, একটু স্যুপ দিয়ে। দুটো এপিটাইজার পিল খান শোয়ার আগে।

একটু বাদেই তাঁর ঘর থেকে দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল।

অরুন্ধতী ও দিব্যেন্দু কিন্তু আরও কিছুক্ষণ বসলেন, দুজনে একেবারে মুখোমুখি। তারপর দুজনের চোখে চাওয়াচাওয়ি হল। কিন্তু কেউ কথা বললেন না। দিব্যেন্দু একসময় অরুন্ধতীর ডান হাতটা নিজের মুঠোয় নিয়ে এলেন। অরুন্ধতী কিন্তু সরিয়ে নিলেন না। বরং দিব্যেন্দুর কাছে সরে এলেন। দিব্যেন্দুর শক্ত হাতের মধ্যে অরুন্ধতীর নরম হাত ঘামতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই অরুন্ধতী হাতটা সরিয়ে নিলেন। বেয়ারা বলল— 'মেমসাহেব, খানা রেডি।'

তারপর অনেক রাত্রে দিব্যেন্দু যখন চলে গেলেন, আস্তে আস্তে গোটা লেক মার্কেট এরিয়া নিঝুম হয়ে পড়ল। অরুন্ধতী জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন, এ কী রকম হল! তিনি কী ভাবে নিজেকে দিব্যেন্দুর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলছেন। দিব্যেন্দুর পাশেই আরও একজনের মুখ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর ভেসে উঠল দিল্লীর সেক্রেটারীয়েটের আর এক অরুন্ধতী সেনের ছবি।

অরুন্ধতী তখন সবে দিল্লীতে ডেপুটেশনে পোস্টিং নিয়ে এসেছেন। সোসাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটারীরূপে ওটা তখন অরুন্ধতী সেনের থার্ড পোস্টিং। রাণীক্ষেতে আই এ এস ট্রেনিং কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার পর অরুন্ধতী বছরখানেক চন্দননগরের এস ডি ও এবং হুগলীর এ ডি এম হয়ে কাজ করেছেন। দিল্লীতে এসে সেক্রেটারীয়েটেই একদিন শিক্ষাভবনের লিফটে এক পরিচিত মুখের সঙ্গে তাঁর নেহাতই হঠাৎ যোগাযোগ ঘটে গেল। ভদ্রলোককে কলকাতায় রাজভবনে এবং মহাকরণে একাধিকবার অরুন্ধতী দেখেছেন। এক সময় তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। সেইদিনকার গভর্নরের সেক্রেটারী নিখিলেশ সেনগুপ্ত তখন দিল্লীতে এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের এস ও—স্পেশাল অফিসার অন ডিউটি। ভারী স্মার্ট, সুদর্শন, পঁয়ত্রিশ বছরের মাঝারী দোহারা চেহারা। সুপুরুষ। দীর্ঘ নাসা, টানা টানা চোখ। চোখে চওড়া ফ্রেমের বড় গ্লাসের পাওয়ারফুল চশমা। দেখতে অনেকটা হলিউডে ব্যস্ত নায়ক রক হাডসনের মত। যে-কোন ছবির হিরো হবার মত চেহারা। কলকাতায় যার সঙ্গে পরিচয়, দিল্লীতে থাকাকালীন সেই নিখিলেশ সেনগুপ্তর সঙ্গে তাঁর আরও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ এল। সেই ঘনিষ্ঠতা রূপান্তর নিল প্রেমে। এবং সেই প্রেমের অনিবার্য পরিণতি হল পরিণয়ে। অরুন্ধতীর মনে আছে, বেশ জাঁক করেই দিল্লীতে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, নেহরু এবং আরও সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা থেকে ডাঃ রায়ও গিয়েছিলেন।

বিয়ের পর ক'টা মাস নিখিলেশ-অরুন্ধতীর জীবন যে কী ভাবে

কেটেছিল, তা অরুন্ধতীর নিজেরই ভাল করে মনে নেই। মনে রাখবার মত মনটাই তখন তাঁর ছিল না। দিল্লীর সেক্রেটারীয়েট, সেক্রেটারীয়েটের বাইরে, কুতুবমিনারে, আগ্রার তাজমহলের নীচে, এখানে সেখানে এই প্রণয়ীযুগলকে লোকে নানা জায়গায় নানা-ভাবে দেখেছে। কেউ বলেছে রোমিও-জুলিয়েট, কেউ বলেছে হ্যামলেট-ওফেলিয়া। কখনও হাতে হাত ধরে শিক্ষাভবনের সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। কখনও চাঁদনি রাতে তাজমহলের শ্বেতমর্মরের চাতালে অরুন্ধতীর কোলে মাথা রেখে নিখিলেশ। একটি ঠোঁটের উপর অপর একটি ঠোঁট অজান্তেই নেমে এসেছে। কখনও ছুটির দিনে অরুন্ধতীকে পাশে নিয়ে নিখিলেশের নীলরংয়ের ছোট ফিয়াট জি টি রোড ধরে মাইলের পর মাইল ছুটে গিয়েছে। কখনও স্টিয়ারিং হাতে অরুন্ধতী, পাশে নিখিলেশ। গাড়ি চালাতে চালাতে যখন নিখিলেশের দুষ্টু হাত অরুন্ধতীর কাঁধের উপর আস্তে আস্তে উঠে এসেছে, অরুন্ধতী ব্রেক টেনে ধরেছেন—'তুমি এরকম দুষ্টুমি করলে গাড়ি আর চলবে না।' তারপর দুজনেই হাসতে হাসতে গাড়ি থেকে নেমে নির্জন পথের প্রান্তে পাথরের ঢিপির উপর বসে প্রেম নিবেদন করেছেন।

অরুন্ধতী এবার মাথার কাছে বেডসুইচটা টিপতেই গোটা ঘরে নীল আলো ছড়িয়ে পড়ল। বাইরে রাস্তায় গোটা কয়েক কুকুর একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। তাদের চিৎকার শুনে অরুন্ধতীর অ্যাল-সেসিয়ান ঘেউ ঘেউ করে ডেকে আবার থেমে গেল। একবার বাইরে বারান্দায় ছুটে গেল, তারপর ফিরে এসেই অরুন্ধতী পাশের খাটটায় শুয়ে পড়ল।

অরুন্ধতী গুণে দেখলেন পুরো একটা বছরও ঘুরল না, তাঁর ও নিখিলেশের জীবনের মাঝখানে একটা কালো পর্দা নেমে এল। ওঁদের জীবনের মাঝখানে এল এক তৃতীয় ব্যক্তি। যার নাম প্রীতম কাউল। নিখিলেশের আণ্ডারে শিক্ষাদপ্তরের এক গ্রেড টু ক্লার্ক। আসলে কিন্তু তার পোস্টিং হল নিখিলেশেরই নিজস্ব

স্টেনো-টাইপিস্ট।

একটু আগেই অরুন্ধতী দেওয়ালের গায়ে একটা গিরগিটিকে একটা আরশোলার পেছনে সতর্কতার সঙ্গে পিছু নিতে দেখেছেন। ধীরে ধীরে ওর পিছু পিছু গিয়ে হঠাৎ এক সময় গিরগিটিটা আরশোলাটাকে খপাৎ করে ধরে ফেলেই মুখে পুরে দিয়েছিল। দৃশ্যটা দেখতে অরুন্ধতীর ভাল লাগেনি। এখন নিখিলেশ-প্রীতমের কথা মনে হতেই গিরগিটিটাকে অরুন্ধতীর প্রীতমের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হল। ঠিক গিরগিটিটার মতই সতর্ক গতিতে নিখিলেশের পিছু নিতে নিতে প্রীতম এক সময় নিখিলেশকে খপাৎ করে ধরে ফেলেছিল। কিন্তু তাই বা হবে কী করে! নিখিলেশ তো ছেলেমানুষ নয়। তারও নিশ্চয় এ ব্যাপারে কম তাগিদ ছিল না! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি নিখিলেশের জীবনে অরুন্ধতীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে অরুন্ধতী ভাবেননি।

তারপর একদিন সেই পঞ্জাব-ললনা প্রীতম কাউল যখন উদ্ধত যৌবন নিয়ে নিখিলেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে রীতিমত বেঁধে ফেলেছে, যখন নিখিলেশ-প্রীতমের ব্যাপারটা গোটা সেক্রেটারীয়েটের স্ক্যানডাল হয়ে দাঁড়াল, নিখিলেশ নিজেই অরুন্ধতীর কাছে সেপারেশন চাইল। অরুন্ধতী সেদিন কিছুমাত্র দ্বিধা না করেই সেপারেশনে রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন যেখানে মনের মিলেরই একান্ত অভাব, সেখানে জোর করে কাউকে ধরে রাখার কোন হেতু হয় না। কিন্তু আজ ভাবছেন, সেদিন বোধহয় এত সহজেই ব্যাপারটার মীমাংসা না করে নিলেই পারতেন। নিজের জিনিসকে নিজে কেন জোর করে ধরে রাখলেন না? তারও অনেকদিন পর অরুন্ধতী শুনেছিলেন, নিখিলেশ প্রীতমকে বিয়ে করেছে। বছর পেরোতেই ওদের একটা ছেলেও হয়েছিল। শেষে একদিন বৌ-ছেলে নিয়ে নিখিলেশ ফরেন সার্ভিসে ইরাক চলে গিয়েছিল।

নিখিলেশের মুখটা সরে যেতেই অরুন্ধতীর সামনে দিব্যেন্দুর মুখটা ভেসে উঠল। ওঁর দেহে এখনও ঘন্টাখানেক আগেকার দিব্যেন্দু দত্তর স্পর্শ লেগে রয়েছে। দিব্যেন্দু অরুন্ধতীর চেয়ে বছরেই শুধু

ছোট নয়, সার্ভিসেও দুই ইয়ারের জুনিয়ার। ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাডারের আই এ এস হলেও, ওরা বহুদিন ধরে লক্ষ্ণৌর প্রবাসী বাঙালী। লক্ষ্ণৌতেই প্রায় দুই পুরুষ ধরে ওরা সেটেল্‌ড। দিব্যেন্দুর বাবা ওখানকার বিশিষ্ট ডাক্তার, কলকাতার বিধান রায়। দিব্যেন্দু কিন্তু কলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছে। আই এ এস হয়েছে। ওর আরও দুটো ভাই একটি বোন আছে। তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ভাইরা সব মারকেনটাইল ফারমের বড় চাকুরে।

দিল্লী থেকে কলকাতার সেক্রেটারীয়েটে পোস্টিং নিয়ে আসার পর মাত্র মাস দুয়েক দিব্যেন্দুর পাশাপাশি ঘরে থেকে অরুন্ধতী কাজ করেছেন। দিব্যেন্দু দত্ত তখন আণ্ডার সেক্রেটারী ফর হোম অ্যাফেয়ার্স। তার পাশেই জয়েন্ট সেক্রেটারী ফর হোম এডমিনিস্ট্রেশন অরুন্ধতী সেনের চেম্বার। মহাকরণে এসে অরুন্ধতী দিব্যেন্দু দত্তকে সত্যিকার বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলেন। সময় অসময় ওঁরা বারংবার মিলেছেন। পরামর্শ করেছেন। একে অন্যজনকে সাহায্য করেছেন। এরই মধ্যে কবে দুজনের সম্বোধন 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে গিয়ে ঠেকেছে, কেউই খেয়াল রাখেননি। ওঁদের এই বারংবার মেলামেশা, একে অপরকে ভাল লাগার নাম কী তবে প্রেম! নিখিলেশের পাশে দিব্যেন্দু দত্তকে ভাবতে অরুন্ধতীর ভালই লাগে। কিন্তু তা কী করে হবে?

ট্রান্সপোর্ট কমিশনার কংস চাকলাদার ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে কর্নফ্লেকে দুধ ঢালছিলেন। ঝন ঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল। কিন্তু কংস চাকলাদারের কিছুই করার নেই। কারণ টেলিফোনটা যে ঘরে, তা ভিতর থেকে লক্ করা। কেয়া চাকলাদার তখন সে ঘরে ম্যাসাজ নিচ্ছেন। এই রোজ সকালে বাথ নেবার আগে ম্যাসাজ নেওয়াটা কেয়া চাকলাদারের এখন নিত্যকার রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্ক স্ট্রীট থেকে কেয়া চাকলাদারের ম্যাসাজার আসে।

টেলিফোনটা বার কয়েক বেজেই আবার থেমে গেল। ব্রেকফাস্ট করতে করতে কংস চাকলাদার ভেবে নিচ্ছিলেন, আজ সেক্রেটারীয়েটে গিয়ে প্রথমে স্টেট ট্রান্সপোর্টের চেয়ারম্যান নরহরি দত্তকে ডেকে পাঠাবেন। সেই আটটা বাস রিকুইজিশনের ব্যাপারটা পাকা করে নেবেন। তাঁর মনে পড়ল, আগের রাত্রেই শ্রমিক নেতা অতনু রায়কে পাকা কথা দিয়ে ফেলেছেন। এখন আর সে কথা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তা ছাড়া, অতনু রায়রা শক্তিশালী বিরোধী দল। যে-কোন দিন আবার পাওয়ারে আসতে পারে। ওদের ডিসপ্লিজ করা চলে না। কংস চাকলাদার নিজেও তো ওদের কাছ থেকে কম উপকার পাননি। এই তো গেলবার ওদের পার্টির মিনিস্ট্রিতে কী রকম সহজে নর্থ বেঙ্গল থেকে রাইটার্সে ওঁর পোস্টিং হয়ে গেল। আর অতনু রায় না থাকলে কী তা সম্ভব হত ?

কংস চাকলাদার ভেবে দেখলেন, নরহরি দত্ত খুব হেলপ্‌ফুল এ-সব ব্যাপারে। ভদ্রলোক একটু ছিটেয়াল, মাস চারেক বাদেই রিটায়ার করবেন। তবু কংস চাকলাদারকে কখনও ডিসওব্‌লাইজ করেননি। আর কংস ওঁর সব ব্যাপারেই ভিটো দিয়ে আসছিলেন। এই তো গভর্নমেন্টের, খোদ চীফ সেক্রেটারীর প্রোটেস্ট সত্ত্বেও যখন

নরহরি দত্ত স্টেটবাসগুলোর বাংলা নাম রাখতে শুরু করে দিলেন, কংসর ব্যাপারটা খুব ফানি মনে হলেও, তাঁকে সাপোর্ট দিয়ে এসেছিলেন। গভর্নরকে এ ব্যাপারে কনভিনস্ করিয়েছিলেন। কংস চাকলাদার ভাবলেন, নরহরি দত্তকে এক বছর এক্সটেনশনের জন্য গভর্নমেন্টের কাছে সুপারিশ করবেন।

একটু পরই কেয়া চাকলাদারের ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল। ম্যাসাজ দেবার মেয়েটি বেরিয়ে যেতেই কাপড়টাকে কোন রকমে শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে কেয়া উল্টো দিকের ঘরের সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। তার যাবার দিকে তাকিয়ে কংস একটু হাসলেন। ভাবলেন, সত্যিই বিয়ের পর, বিশেষ করে মুনমুন হবার পর থেকেই কেয়া আস্তে আস্তে কী রকম মুটিয়ে যাচ্ছে।

কেয়া চাকলাদারকে কংস ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। তখন কেয়া চাকলাদার, কেয়া সান্যাল। বাংলা ছবির নাম-করা হিরোইন। বিয়ের পরও অবশ্য কেয়া ফিল্ম ওয়ার্লড থেকে নিজেকে একেবারে সরিয়ে নেননি। এখনও স্টুডিও-পাড়ায় তাঁর যাতায়াত আছে। কিছু কিছু সাইড রোলে তিনি পার্টও করেন। তবে হিরোইনের পার্ট এখন আর কেউ তাঁকে দিতে চান না। এর কারণ এই নয় যে, তাঁর অভিনয়-দক্ষতা কমে গিয়েছে। বিয়ের পর আর মেদবহুল শরীরে কোন পরিচালকই তাঁকে নায়িকার রোলে নিতে চান না। আর এর জন্য কংসকেই কেয়ার সবচেয়ে বেশি দায়ী মনে হয়েছে। তাই যেদিন পার্ক স্ট্রীটে গিয়ে মাসিক দেড়শ টাকায় নিজের জন্য নিজেই ম্যাসাজ দেবার লোক ঠিক করে এলেন, কংস আপত্তি করতে পারেননি। কেয়া চাকলাদারের নিশ্চিত বিশ্বাস, এই ম্যাসাজের ফলে শীঘ্রই তাঁর শরীরের ফালতু মেদ চলে গেলেই, আবার ডাইরেক্টররা তাকে নাইকার রোলে চান্স দেবেন।

কিছু সময় বাদে বাথ টাওয়েলটা চুলে জড়িয়ে কাপড়ে শরীরটাকে ঢেকে কেয়া বাথরুম থেকে শোয়ার ঘরে ঢুকলেন। এয়ার-কণ্ডিশান মেশিনটা চালু করে দিলেন।

তারপর ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে মেক-আপ নিতে লাগলেন। একটু বাদেই বাথ নিয়ে কংসও সেই ঘরে এসে ঢুকলেন। কেয়া ব্র্যাসিয়ার লাগাতে লাগাতে কংসের দিকে পিঠ করে দাঁড়ালেন —'বডিস হুক করো কংস!'

কংস চাকলাদার আপিসে বেরিয়ে যাবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই টেলিফোন বেজে উঠল। কেয়া তখন সোফায় হেলে মুনমুনকে চিঠি লিখছিলেন। এবার ছুটিতে ওর কলকাতায় আসার দরকার নেই। মারামারি খুনোখুনিতে কলকাতা এখন হরিবল্ প্লেস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেয়া লিখছিলেন, ও এবং কংসই বরং দার্জিলিং ঘুরে আসবে। কংসকে দার্জিলিংয়ে সেই ট্রান্সপোর্ট উইকের একটা ফাংশন না হয় অরগানাইজ করতে বলবেন। তা হলে ডিউটিতেই যাওয়া চলবে। মেয়েও দেখা হবে আর চেঞ্জও নেওয়া হবে।

রিসিভার কানে তুলতেই কেয়া বুঝলেন—কংস চাকলাদার।

'হ্যালো, তুমি কী আজ বেরোচ্ছ নাকি? এদিকে কিন্তু সিরিয়াস অবস্থা। দুটো ট্রাম পুড়েছে। এমপ্লয়িজদের প্রোসেশন বেরিয়েছে। পুলিস টিয়ারগ্যাস, লাঠি চার্জ করেছে।'

'তুমি হাসালে কংস। এ-সব প্রোসেশন, টিয়ারগ্যাস, লাঠি চার্জ কী কলকাতায় নতুন নাকি? কী বললে, এমপ্লয়িজরা বিরাট মিছিল বের করেছে? তোমাদের স্টেট এমপ্লয়িজদের কথা আর বলো না কংস। ওদের মুরোদ জানতে আমার বাকি নেই। সাতটা দিন পেরিয়ে গেল, তেরোজন কর্মীর তিনশো এগারোয় ডিসমিশাল হল, কিন্তু সকলেই চুপটি করে বসে। আর এখন করবে বিপ্লব!

'হ্যাঁ, শোন কংস, আমাকে নিউ মার্কেটে একবার যেতে হবে। তারপর ক্যালকাটা ক্লাবে সাঁতার কাটতে যাব। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনে আছে, আমি ছ'টার আগেই ফিরে আসব। আরে, যা বাবা, ঠিক আছে, আই উইল রিমেম্বার। ঠিক আছে, নির্মলকে ফোন

করে এখন বেরোব।'

কেয়া রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। চিঠি লেখা শেষ করে আর্দালি পেয়ার আলিকে ডাকলেন চিঠিটা পোস্ট করে দেবার জন্য। বাজারের টুকিটাকি কয়েকটা ফরমায়েশ দিলেন। তারপরই টেলিফোন সামনে নিয়ে মিশন রো-র নম্বরে ডায়াল করতে লাগলেন।

গলা শুনেই বুঝতে পারলেন ওপাশে খুকু—'কী রে, সেজদি নাকি? কী ব্যাপার রে?'

'হ্যাঁরে খুকু, তোদের ওদিকে কী সব গণ্ডগোল হচ্ছে রে?' কেয়া জানতে চাইলেন ছোট বোনের কাছে।

'কে বলল রে, কংসদা নাকি? এ আবার গণ্ডগোল কী? একটা প্রোসেশন এই তো বাড়ির সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল শ্লোগান দিতে দিতে। দুটো পটকা ফাটার শব্দও শুনেছি। কলকাতা শহরে এখন একেও গণ্ডগোল বলতে বলিস, সত্যিই সেজদি তুই হাসালি! কংসদা এখন একটা ডিজিস-এ ভুগছেন, যার নাম কিন্তু সব্যসাচী বসু।' হাসতে হাসতে খুকু টেলিফোন ছেড়ে দিল।

টেলিফোন রেখে কেয়া লাঞ্চ নিয়ে বসলেন। লাঞ্চ সেরে ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেক-আপটা ঠিক করে নিলেন। (ঠোঁটে লিপস্টিক বোলালেন, ফেস পাউডার গালে ঘষলেন। বিলাতি শিশি থেকে সেন্ট ব্লাউজে কাপড়ে ছিটিয়ে নিলেন।) তারপর উপর থেকেই ড্রাইভারকে গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করে দরজার সামনে পার্ক করে রাখতে বললেন। ঠিক বেরোবার মুখে কেয়া লালবাজার চেয়ে ডি সি হেড-কোয়ার্টারকে চাইলেন।

'হ্যালো নির্মল, আমি কেয়াবৌদি। শহরের কী অবস্থা বলো?'

'সকালের দিকে ডালহৌসির দিকে একটু গণ্ডগোল হয়েছিল, এখন অলরাইট।' ডি সি হেড-কোয়ার্টার নির্মল মজুমদার কেয়াকে জানালেন।

'এখন বেরনো যাবে তো? কী বললে, সেফ্লি? সত্যি নির্মল,

আমি যা আপসেট হয়ে গিয়েছিলাম তোমার দাদার ফোন পেয়ে! জান, কুকুরের বিস্কুট ফুরিয়ে গেছে দুদিন আগে। ফ্রিজে সোডা নেই, তা ছাড়া কিছু কেনাকাটাও আছে। তুমি তো জান নির্মল, সাঁতার না কাটলে আমার রাত্রে ঘুমই হয় না।' কেয়া চাকলাদার টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

সন্ধ্যা না হতেই কংস চাকলাদারের নিউ আলিপুরের বাড়ির সামনে একে একে গাড়ি এসে থামতে লাগল। প্রথমে এলেন ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্টের চেয়ারম্যান নরহরি দত্ত, আই এ এস। সঙ্গে এলেন তাঁর মেয়ে সুনন্দা দত্ত। তারপর একে একে এলেন কৃষি-কমিশনার সুবল গুহ মজুমদার, সস্ত্রীক ফিনান্সের ডেপুটি সেক্রেটারী গোলকপতি রায়, কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টর কল্পতরু ঘোষ, সস্ত্রীক মেম্বার বোর্ড অফ রেভিন্যু ব্রজমাধব বিশ্বাস, পুনর্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারী সুধাময় মল্লিক, সিভিল ডিফেন্সের জয়েন্ট ডাইরেক্টর অরুণ দত্ত, শ্রমিক নেতা অতনু রায় এবং পরাশর চক্রবর্তী। সব শেষে এলেন সস্ত্রীক হোম সেক্রেটারী অংশুমান রায়। সকলেই সকলের পরিচিত। একাধিক দিন সপ্তাহে তাদের বিভিন্ন জায়গায় পার্টিতে দেখা হয়।

কংস চাকলাদারের বাড়িটা অনেকটা জায়গা নিয়ে। দোতলা বাড়ি। ঢুকতেই সামনে এবং ডানদিকে মাঝারী সাইজের বাগান। তাতে বাহারী সব ফুলের গাছ। অনেক গাছে ফুল ধরে রয়েছে। ভেতরে একতলায় চারটে ঘর, একটা বসবার। অপর তিনটের একটাতে লাইব্রেরী, একটা স্টোর রুম। পাশেই আর্দালি-বাবুর্চির কোয়ার্টার। দোতলায় তিনটে ঘরের একটিতে, যেটায় এয়ার-কনডিশন মেশিন বসানো, কংস চাকলাদার এবং কেয়া চাকলাদারের শোবার ঘর। আর একটাতে দার্জিলিং থেকে স্কুল ছুটি হলে মুনমুন মাঝে-সাঝে এসে থাকে। পাশেরটা গেস্ট-রুম। তিনটে ঘরের মাঝখানটায় অনেকটা জায়গা, সেখানে কার্পেট পাতা। গোটা কয়েক চেয়ার-টেবিল এবং সোফা সাজানো। এক কোণে বড় একটা ল্যাম্প-স্ট্যাণ্ড। রেডিওগ্রাম। দেওয়ালে কয়েকটা স্কেচ, পেন্টিং ফটো। পাশেই ব্যালকনি, সেখানেও বেশ কিছুটা জায়গা।

দোতলার এক দিকে প্যান্ট্রি।

ওঁরা সকলেই দোতলায় তিনটে ঘরের মাঝখানের কার্পেট দেওয়া জায়গায় এসে জড় হলেন। যে যার চেয়ারে বসতে বসতেই কিংবা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই, বেয়ারা-বাবুর্চিরা ট্রে করে ড্রিংকস্ সার্ভ করতে লাগল। কেয়া এবং সুনন্দা ওদের ড্রিংকস্ সার্ভ করতে সাহায্য করতে লাগলেন। যে যার ইচ্ছে মত কেউ হুইস্কি, কেউ কোকাকোলা মিশিয়ে রাম, কেউ লাইম দেওয়া জিন, কেউ আবার বিয়ারের গ্লাস তুলে নিলেন। সুনন্দা নিজে নিলেন লাইম-জিন। গ্লাসে কয়েক কুচি বরফ ফেলে দিলেন। কেয়া বেশি সোডা মিশিয়ে হুইস্কি নিলেন এবং ব্রজমাধব বিশ্বাসের বয়স্কা স্ত্রী নিলেন ওয়াইন। কেয়ার মনে পড়ল, দুটো হোয়াইট লেবেলের বোতল কালই পোর্ট পুলিসের ডি সি কংসকে দিয়ে গিয়েছিল। কেয়া জানেন, পোর্ট পুলিসের এই নতুন ডি সি ডিস্ট্রিক্ট থেকে সবে এসেছে, কংসই হোম সেক্রেটারীকে বলিয়ে তার পোস্টিং করিয়েছেন। বেশ চালাক-চতুর লোক। এটা-সেটা, ভাল ভাল ফরেন ড্রিংকসের বোতল, জাহাজী মাল ও প্রায়ই কংস চাকলাদারকে গিফ্ট হিসেবে দিয়ে যায়।

রামের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে প্রথমে কথা বললেন মেম্বার বোর্ড অফ রেভিন্যু ব্রজমাধব বিশ্বাস—'ওয়েল মাই ফ্রেণ্ডস্, ইউ নো উই মিট হিয়ার টু ডিসকাস এ ভেরি সিরিয়াস ইস্যু। ইস্যু অফ ডিসমিসাল অফ থারটিন পুওর ফেলো কলিগস্ অফ আওয়ার্স। এইবার আমাদের এ ব্যাপারে একটা জয়েণ্ট মুভ করার সময় এসেছে।'

কংস চাকলাদার বললেন—'দ্যাটস্ রাইট স্যার। এ শুধু এমপ্লয়িজদের এগেনস্টে ডিসিপ্লিনারী অ্যাকশন নয়, আমাদের এগেনস্টেও। আই থিঙ্ক উই মাস্ট মিট দ্য চ্যালেঞ্জ।'

শ্রমিক নেতা অতনু রায় বললেন—'স্যার, আপনারা এ ব্যাপারে আমাদের কী ভাবে হেল্প করতে পারেন?' তারপর হোম সেক্রেটারীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'পুলিস কী আমাদের হেল্প করবে?'

হোম সেক্রেটারী বললেন—'দ্যাটস ডিফিকাল্ট। তবে আমার ডি আই জি, আই বি-র সঙ্গে কথা বলা আছে। দরকার হলে কিছু সাদা পোশাকের পুলিস দেবে। তবে ওরা ওয়াচ হিসেবেই থাকবে। এনিওয়ে, ইউ মাস্ট কীপ ইন টাচ উইথ হিম।'

কৃষি-কমিশনার সুবল গুহ মজুমদার বললেন—'স্যার, আপনি দিল্লী গিয়ে জগজীবনবাবুকে একবার বলুন না, এই মার্কেটে এতগুলো লোকের চাকরি গেল। না হয় ভূপেশ গুপ্তকে দিয়ে পি এম-কে ইনফ্লুয়েনস করান স্যার।'

ব্রজমাধব বিশ্বাসের গিন্নী ওয়াইনের গ্লাসে সিপ করতে করতে বললেন—'সত্যি, কারও চাকরি গেছে শুনলে আমার এত খারাপ লাগে! এই গরীব দেশে কত লোক খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না, চাকরি পাচ্ছে না। তারপর চাকরি পেয়েও যদি এভাবে চাকরি লুজ করে, বৌ-ছেলে নিয়ে ওরা খাবে কী? আমি ওকে বলি, তোমরা সব তিন হাজার চার হাজার টাকার ফ্যাট্ স্যালারির অফিসার, কিন্তু কী কুঁটোটি নাড়? সব কিছুর জন্যই তো সেই পেটি ক্লার্কদের উপরই নির্ভর করতে হয়। চাকরি যেতে হয় তো তোমাদেরই আগে যাওয়া উচিত।'

সিভিল ডিফেন্সের অরুণ দত্ত শ্রমিকনেতা পরাশর চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করলেন—'এই ইস্যুতে আপনারা বড় মুভমেণ্টে নামছেন না কেন? বন্ধ্ ডাকছেন না কেন?'

পরাশর চক্রবর্তী বললেন—'মুভমেণ্ট যে রকম চলছে, এই গো স্লো, টিফিন আওয়ার্সে বিক্ষোভ, চলবে। হাই কমাণ্ডের সেই রকম নির্দেশ। আসছে মাসের চৌদ্দই শহীদ মিনারের মিটিংয়ের পর আমাদের ফিউচার অ্যাকশন ঠিক হবে।'

দেখতে দেখতে আসর বেশ জমে উঠল। বেয়ারা ড্রিংকস্, চীপস্, চিকেন রোল, কাজুবাদাম এবং সসেজের প্লেট একের পর এক ঘুরিয়ে নিয়ে চলল।

আসরে সুনন্দাই সবচেয়ে কনিষ্ঠ এবং সকলের পরিচিত।

সি এস টি সি-র চেয়ারম্যান ওকে এক আর্মি অফিসারের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। সুনন্দা দত্ত বিয়ের পর হয়েছে মিসেস কর্নেল ব্যানার্জী। কর্নেল ব্যানার্জীর এখন বর্ডারে পোস্টিং। তাই আপাততঃ অন্ততঃ ছ-মাসের জন্য সুনন্দাকে বাবার কাছেই থাকতে হচ্ছে। আগেও একাধিক বার তাকে এ রকম থাকতে হয়েছে। কংস চাকলাদারের বাড়ির পার্টিতে সে আগেও বহুবার এসেছে।

সুনন্দা সবুজ নাইলনের একটা শাড়ি পরেছেন। হাত-কাটা ছোট টাইট ব্লাউজ, নাভির কাছটা খোলা। ড্রিঙ্কসের গ্লাস হাতে যখন বেয়ারাকে ড্রিংকস্ সার্ভ করতে নির্দেশ করছিলেন, প্রায়ই ওঁর বুক থেকে আঁচল খসে পড়ছিল। সুনন্দার ছিপছিপে ফরসা গড়ন। চোখ দুটো একটু কটা। অরুণ দত্তের স্ত্রী পাপিয়া দত্ত পরেছেন পিঙ্ক ব্লু সিল্কের শাড়ি। তাঁর পাতলা জামার ভিতর থেকে সপুষ্ট যৌবন যেন বেরিয়ে আসছিল। ওঁর ঠোঁটে মোটা করে লিপস্টিক লাগানো। চুলে শ্যাম্পু করা। হোম সেক্রেটারীর স্ত্রী খুব বেশি মেক-আপ নিয়েছেন। ওঁর পাতলা পিওর সিল্কের ভিতর থেকে বুক এবং নাভির কাছে সরু মাজা স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।

রাত হতে দেখা গেল, কেয়া চাকলাদার এবং অংশুমান রায় খুব কাছাকাছি, দুজনে ফিস ফিস করে কথা বলছেন। সুনন্দা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। কৃষি-দপ্তরের কল্পতরু ঘোষও উঠে গেলেন। পাপিয়া দত্ত কংস চাকলাদারকে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। শ্রমিকনেতা অতনু রায় এবং পরাশর চক্রবর্তী রাত গড়িয়ে চলেছে দেখে এক সময় উঠে পড়লেন। বউবাজার স্ট্রীটের পার্টির আপিসে ওঁরা যাবেন। সব দেখেশুনে ব্রজমাধব বিশ্বাসের গিন্নী পাশে বসা পুনর্বাসন দপ্তরের সুধাময় মল্লিকের ডান হাতটা কাছে টেনে নিলেন।

অনেক রাত্রে একে একে সকলে চলে গেলে, ডিশ, প্লেট, ভাঙা কাঁচের টুকরো, বোতল, গ্লাস সরিয়ে ঘর সাফ করে বেয়ারা নীচে নেমে

গেল। কেয়া চাকলাদার ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়লেন, রাত্রিবাস পরলেন, তারপর গালে ক্রিম ঘষতে ঘষতে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। একটু বাদেই কংস চাকলাদারও ঘরে ঢুকলেন। ডান হাতে ওয়াইন-পটে ভারমুথ সিপ করতে করতে খাটে শোয়া কেয়া চাকলাদারের পাশে এসে বসলেন। একটু পরই কেয়ার বুকের মাঝখানে মুখটা গুঁজে দিলেন। কেয়াও দু-হাতে ওর মাথাটা কাছে টেনে নিয়ে বুকে, ঘাড়ে, ঠোঁটে চুমোয় চুমোয় ভরে দিতে লাগলেন। তারপর এক সময় দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

তখন সবে ভোর হয়েছে। শিয়ালদ থেকে চৌদ্দ নম্বরের প্রথম ট্রামটা লালদীঘি ঘুরে একটু আগেই হাইকোর্টের দিকে চলে গেল। এ সময় ট্রামে কিন্তু নেহাত কম ভিড় থাকে না। যাঁরা থাকেন, তাঁরা এক বিশেষ শ্রেণীর যাত্রী। গঙ্গার স্নানার্থী। সব পুণ্যার্থীর দল।

মহাকরণে কিন্তু এরই মধ্যে ভোর হয়েছে। কেয়ার-টেকারের খাস আর্দালি চাবির গোছা হাতে নিয়ে একে একে ঘর খুলে চলেছে। তার পাশে পাশে চলেছে হরিহর। কেয়ার-টেকারবাবুর অ্যাসিস্টাণ্ট হরিহর। তার পোস্টিংয়ের নামটা কিন্তু ফরাস।

এই হরিহর অনেক দিন আগে এক সময় ওর বাবার সঙ্গে এই ভাবে রাইটার্সের দপ্তরে দপ্তরে ঘুরেছে। দেখেছে, কী ভাবে বাবা একের পর এক তালার নম্বর মিলিয়ে রিং থেকে চাবি বের করে ঘর খুলে দিয়েছে। তখন ইংরেজ আমল। হরিহর হাফ-প্যাণ্ট পরত। সবে দেশ থেকে এসেছে। তারপর একদিন হরিহরের বাবা মারা গেল। সরকার বাহাদুর হরিহরকে বাবার কাজে বহাল করলেন। বছরের পর বছর সে একা একা রাইটার্সের ঘরগুলো রোজ সকাল-সন্ধ্যা খুলেছে, বন্ধ করেছে। তখন কিন্তু এই আজকের মত রাইটার্সে এত ঘর ছিল না। প্রায় হাতে গোনা যেত ঘর। আর এত নতুন নতুন এক্সটেনশনও তৈরি হয়নি। রাইটার্সের স্টাফই কী বাপু তখন এত ছিল!

হরিহর তখনকার কেয়ার-টেকারবাবু অ্যাসবি সাহেবের কাছে একদিন শুনেছিল, এই রাইটার্স বিল্ডিংস তৈরির ইতিহাস। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাইটার বাবুদের জন্য সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে তখনকার সুতানটিতে এই বড় লালবাড়িটা তৈরি হল। তার অনেক পরে, অ্যাসলি ইডেন যখন লেফটেনাণ্ট গভর্নর, সেদিনকার সেই রাইটার্স বিল্ডিংসকে আরও বাড়ালেন। যাতে আরও বেশি রাইটার

বাবুদের মাথা গোঁজবার জায়গা দেওয়া যায়। তারও অনেক অনেক পরে রাইটার্স বিল্ডিংস বর্তমান আকার নিল। রংটা কিন্তু বরাবরই সেই লালই রইল। আর সামনের গোলদীঘির জলে তার লাল ছায়া সারাক্ষণই পড়ে থাকত। লোকে ভাবত বুঝি জলই লাল। সেই থেকেই গোলদীঘিটাকে লোকে লালদীঘি বলতে শুরু করল। এখনও যদিও মহাকরণের রং লালই, লালদীঘির জলে কিন্তু লাল ছায়া পড়ে না। পাশের টেলিফোন ভবনের বড় সাদা বাড়ির ছায়াই সারাক্ষণ সে জলে ছেয়ে থাকে। তবুও লোকে এখনও সেই লালদীঘিই বলে।

হরিহরের মনে পড়ল একদিন তার চাকরিতে প্রোমোশন হল। মাইনেও বাড়ল। অ্যাসলি সাহেবই রিটায়ার করার আগে তাকে কেয়ার-টেকারের অ্যাসিস্টান্ট করে দিয়ে গেলেন। হরিহর ভাবে, একদিন তার ছেলেও এই পোস্টে চাকরি নেবে। তারপর তার ছেলের ছেলে। বংশানুক্রমে সরকারের তারা সেবা করে যাবে।

মহাকরণের ঘরগুলো খুলতে খুলতে হরিহর এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়ুদারও ঘরের ভিতর ঢুকে সাফ করা শুরু করে দিল। সেক্রেটারীদের চেম্বারে কিন্তু হরিহর নিজেই ঢুকে দেখে, কাগজ ফাইলপত্র সব ঠিকঠাক আছে কিনা। হরিহর বৃদ্ধ হয়েছে, কাজে শক্তিও কম পায়। একটু বেশি কাজ করলেই হাঁপিয়ে ওঠে। তবুও এই সেক্রেটারীদের ঘরগুলোতে সে অন্য কাউকে ঢুকতে দেয় না। নিজেই দাঁড়িয়ে ঝাড়ুদারকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে তারপর ঘরে তালা লাগিয়ে দেয়। ও জানে ওই সব বাবুদের ঘরে সব গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ফাইল থাকে। একটা হারিয়ে গেলেই মুশকিল। তাতে গভর্ণমেণ্ট অচল পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

জয়েণ্ট সেক্রেটারী হোমের ঘরটা খুলতেই এদিক ওদিক ঝটপট অনেকগুলো ইঁদুর পালিয়ে গেল। হরিহর দেখল কয়েকটা ফাইল সবে কুট কুট করে ইঁদুরগুলো কাটতে শুরু করেছিল। হরিহর একবার হেই হেই করে চেঁচিয়ে উঠল। ফাইলের স্তূপ থেকে আরও

কয়েকটা ইঁদুর লাফিয়ে চলে গেল।

হরিহর ভাবল, এই ইঁদুর মারার জন্যই রাইটার্সে একদিন বিড়ালপিছু বছরে নগদ বিশ টাকা মাইনে দিয়ে একসঙ্গে প্রায় পঞ্চাশটা বিড়াল পোষা হত। অ্যাসলি সাহেবের চেষ্টাতেই সেটা হয়েছিল। তাতে কাগজ, ফাইলপত্র ঠিকঠাক থাকত। কিন্তু এখন এ নিয়ে আর কেউ ভাবেন না। হরিহর ভাবে, এখনকার বাবুদের সব কিছুই যেন আলাদা। সকলেই যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। সরকারের কথা, এই মহাকরণের কথা কেউই আর ভাবে না। যার যা খুশী করছে। সরকারের কাগজপত্র, কালি পেন পেন্সিল পিন সব বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। সরকারী সম্পদ ইচ্ছেমত সব ভোগ করছে। ওরা পারলে গোটা আপিসটাই এখন বাড়ি নিয়ে যায়।

আরও পরে এক এক করে সব বাবুরা আপিসে আসবেন। কেউ শিয়ালদা থেকে ট্রামে চেপে, কেউ হাওড়া স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে। সাহেববাবুরা আসবেন একে একে গাড়ি চড়ে। বাবুদের আপিস যখন শুরু, হরিহরের তখন ছুটি। আবার বাবুদের পাঁচটা বাজলে ছুটি। হরিহরের তখন কাজের শুরু।

একে একে কর্মচারীরা মহাকরণে আসতে শুরু করলেই, প্রাণহীন স্তব্ধ রাইটার্স বিল্ডিংস আবার গম গম করে ওঠে। প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরে উঠে। আবার পাঁচটার পর যখন সকলেই বাড়ি চলে যায়, পশ্চিম আকাশে জি পি ও-র মাথার উপর সূর্য যখন হেলে পড়ে, তখন আস্তে আস্তে আপিস-পাড়ার এই বড় লালবাড়িটাও যেন স্তব্ধ বোবা হয়ে যায়।

অরুন্ধতী সেন কাঁটায় কাঁটায় দশটাতেই আপিসে এলেন। সেন্ট্রাল স্টেয়ারকেসের কাছে তাঁর গাড়িটা এসে দাঁড়াতেই, বনমালী গাড়ির দরজা খুলে দিল। অরুন্ধতীকে নামতে দেখে অন ডিউটি

সার্জেণ্ট স্যালুট করে দাঁড়াল। অরুন্ধতী লিফ্টের দিকে এগিয়ে গেলেন।

নিজের চেম্বারে এসে দেখলেন, দুজন ভিজিটার, তাদের মধ্যে একজন আবার মহিলা, পি এ-র সামনে চেয়ারে বসে রয়েছেন। চেয়ারে বসেই টেবিলের উপর ভিজিটার্স স্লিপের উপর চোখ বুলিয়ে দেখলেন। তারপর বেল টিপলেন। বনমালী আসতেই ভিজিটার-দের ডাকতে বললেন।

ভদ্রমহিলা দত্তবাগান থেকে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর দেবর। ওঁদের কাছে শুনলেন ভদ্রমহিলার একমাত্র চব্বিশ বছরের ছেলেকে পুলিস চারদিন আগে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে ছেলের কোন খবর নেই। থানাতে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, ওই নামে পুলিস কাউকে অ্যারেস্ট করেনি। তবে নকশালদের ওয়ানটেড লিস্টে ছেলেটির নাম রয়েছে। ভদ্রমহিলার সন্দেহ, পুলিস বোধহয় ছেলেকে মেরেই ফেলেছে। ছেলের সম্বন্ধে একটা হদিশ বের করে দিতে অরুন্ধতীর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন। চীৎপুর থানা এবং লালবাজার প্রায় রোজই তিনি করেছেন, কিছু হয়নি। ভদ্রমহিলার স্বামী বাইরে চাকরি করেন। তাই তাঁকেই এই দৌড়ঝাঁপ করতে হচ্ছে।

অরুন্ধতী ছেলেটির নাম-ধাম লিখে রেখে ভদ্রমহিলাকে চলে যেতে বললেন। বললেন, তিনি খোঁজখবর নিয়ে রাখবেন। পরে তাঁকে খোঁজ নিতে বললেন।

ভদ্রমহিলা চলে যেতেই অরুন্ধতী ভেবে দেখলেন, এ রকম আরও বেশ কিছু অভিযোগ তাঁর কানে এসেছে। পুলিস নাকি নকশালদের ধরে নিয়ে গিয়ে স্রেফ গুলি করে মারছে। থানা পর্যন্তও নাকি নিয়ে যাচ্ছে না।

অরুন্ধতী নিজে অবশ্য তা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু লোকের সামনে থেকে পুলিস একজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে পরে বলবে তার সম্পর্কে কিছুই জানে না, তার নামে ডায়েরী হয়নি, তাকে আটকও

করা হয়নি, ঘরের ছেলে আর ঘরে ফিরবে না—এই বা কেমন কথা!

অরুন্ধতী ভাবলেন এ ব্যাপারে একটা নিরপেক্ষ তদন্ত করাবেন। তবে কোন হাইকোর্ট-জজকে দিয়ে নয়। কারণ, অরুন্ধতী ভেবে দেখলেন, এখনও পাঁচ-পাঁচটা এনকোয়ারী কমিশন জাজের অভাবে তৈরী করাই যায়নি। কেউই আর কমিশনের চেয়ারম্যান হতে চাইছেন না ভয়ে। বারাসাত তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান টি পি মুখার্জির আক্রান্ত হবার ঘটনার পর থেকে কেউই আর কমিশনারের দায়িত্ব নিতে চাইছেন না।

এনগেজমেন্ট ক্যালেণ্ডারে অরুন্ধতী দেখলেন, রোটাণ্ডায় দুটোর সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের একটা মিটিং রয়েছে। কী ভাবে পুলিস-পাবলিক এক হয়ে, পলিটিকাল পার্টিগুলি হাতে হাত মিলিয়ে পাড়ায় পাড়ায় খুনোখুনি বন্ধ করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা হবে। অবশ্য এ মিটিংয়ে প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে থাকছেন ইন্দ্রজিৎ সরকার। এক পলিটিক্যাল লিডার। তাঁরই উদ্যোগে এই সভা।

অরুন্ধতী ভেবে দেখলেন, আগেও এ রকম মিটিং দুটো হয়েছে এই রোটাণ্ডাতে। মিটিংয়ে সবাই পবিত্র শপথ বাক্য পাঠ করেছেন। আজ থেকে খুনোখুনি সব বন্ধ। কেউ কারও সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করবে না। করলেও অপর দলগুলি এগিয়ে এসে মিটিয়ে দেবে। মিটিং হলে, রাইটার্সের কেটারিং থেকে কফি, স্যানডুইচ, মিষ্টি একাধিকবার মিটিং-রুমে এসেছে গিয়েছে।

মিটিংয়ে শেষে সব দলের নেতারাই ভাই ভাই হয়ে হাত-ধরাধরি করে মিটিং থেকে বেরিয়ে যান। আজ থেকে কেউ কারও শত্রু নয়, সকলেই বন্ধু। কিন্তু পাড়ায় গেলে আবার যে কে সেই। পরদিনই কাগজে খবর বেরোচ্ছে, অমুক জায়গায় তিনটে, তমুক জায়গায় চারটে খুন।

এ সব মিটিংয়ে কিছু ফয়দা হয় না তা অরুন্ধতী বুঝেই নিয়ে-

ছিলেন। নিজেও আগের দু-দুটো মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। তবুও আজ তাঁকে এ মিটিং এ্যাটেণ্ড করতে হবে। কিছু হবে না জেনেও মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে হবে।

অরুন্ধতী ঘর থেকে বেরিয়ে পাশেই চীফ সেক্রেটারীর ঘরে একবার উঁকি মারলেন। দেখলেন, চীফ সেক্রেটারীর ঘরে মুরারী ভট্টাচার্য বসে। হস্তরেখা বিশারদ এই মুরারী ভট্টাচার্যকে রাইটার্সের সব অফিসাররাই চেনেন। সবার ঘরেই ওঁকে সময় অসময় দেখতে পাওয়া যায়। ওঁর খাতিরও অনেক। ঘরে ঘরে সরকারী অফিসারদের হাত দেখে বেড়ানো ওঁর কাজ। ওঁর ভবিষ্যৎ-বাণী কাজে লাগে কি লাগে না, তা অরুন্ধতী জানেন না, তবে অরুন্ধতী দেখেছেন কম বেশি সকলেই তাঁকে খাতির করেন।

অরুন্ধতী নিজে কিন্তু মুরারী ভট্টাচার্যকে একবারও হাত দেখাননি। আর পাঁচজন অফিসারের মত তাঁকেও দেখেই মুরারী আংটি ধারণ করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ হাতের সব ক'টা আঙুলে মুরারী ভট্টাচার্যের নির্দেশ মত নীলা, পলা, গোমেদ, পোখরাজ সব কিছুরই আংটি পরেও অফিসাররা অরুন্ধতীর চেয়ে বেশি ভাগ্যবান, সুখী, তা অরুন্ধতীর কোনদিনই মনে হয়নি।

নিজের ঘরে ফিরে এলেন অরুন্ধতী। ইতিমধ্যেই একদল রিপোর্টার তাঁর চেম্বারে ঢুকলেন। এ-কথা সে-কথা বলার পর রিপোর্টাররা চলে যেতেই অরুন্ধতী লাঞ্চ সেরে রোটাণ্ডার দিকে চললেন। তারপর আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার পরই আবার নিজের চেম্বারে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন তাঁর ঘরে কমিশনার অফ পুলিস রুনু সান্যাল ওয়েট করছেন।

খবরটা অরুন্ধতী সেদিন আপিসে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলেন। লালবাজার থেকে সি পি-ই ফোন করে জানালেন। লালবাজারের সেন্ট্রাল বিল্ডিংসের লিফটে একটা হাই-এক্সপ্লোসিভ গ্রেনেড কে যেন রেখে গেছে। ভাগ্যিস, সেটা ফাটেনি।

সি পি তখনও ডিউটিতে আসেননি। আসার সময় সবে হয়েছে। ডি সি, ডি ডি লিফ্‌টে উঠতে যাচ্ছিলেন। লিফটে উঠতে গিয়েই দেখলেন একটা চওড়া লোহার পাতে মোড়া কী যেন পায়ের কাছে। মাথা নীচু করে ওটা পরীক্ষা করতেই ঝটিতি এক লাফে লিফটের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

তারপর হৈ হৈ কাণ্ড গোটা লালবাজারে।

এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্টরা এলেন। দেখেই বলে দিলেন ওটা প্রচুর ক্ষমতাশালী গ্রেনেড। এক্সপ্লোসিভ ডিপার্টমেন্টের লোকেরাই ওটাকে এক জলের বালতিতে ডুবিয়ে নিয়ে চলে গেলেন পরীক্ষার জন্য।

অরুন্ধতী মহাকরণে আসতেই চীফ সেক্রেটারী ডেকে পাঠালেন। লালবাজারের লিফটে বোমা সংক্রান্ত ঘটনার একটা সিক্রেট ইনকোয়ারী এস আই বি-কে দিয়ে করাতে বললেন। বললেন— 'লালবাজারের লিফ্‌টে বোমা, এ তো ভাল কথা নয়। কোনদিন দেখব রাইটার্সে গভর্নরের চেম্বারে বোমা!'

চেম্বারে ফিরে এসেই অরুন্ধতী ডি সি, ডি ডি দেবব্রত বসুকে ডেকে পাঠালেন। ওই ভদ্রলোক সম্পর্কে অরুন্ধতী আগেই শুনে-ছিলেন। বহুদিন ধরে লালবাজারে রয়েছেন। ঢুকেছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর হয়ে। আর এখন ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার। লালবাজারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পোস্টিং। ভদ্রলোক খুব সিনসিয়ার এবং এফিসিয়েন্ট। অনেক অফিসারদের কাছেই

শুনেছিলেন। রাইটার্সের বড়কর্তারা পর্যন্ত দেবব্রত বসুর উপর সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। এক কথায় লালবাজার মানেই দেবব্রত বসু। দেবব্রত বসু মানেই লালবাজার। ক্যালকাটা পুলিশের জন হুবার্ট হলেন দেবব্রত বসু।

ডি সি, ডি ডি ঘরে ঢুকতেই অরুন্ধতী পি এ-কে ডেকে দরজার সামনে লাল এনগেজড লাইটটা জ্বালিয়ে দিলেন। পি এ-কে বললেন—'বাইরে থেকে খুব জরুরী কল না এলে লাইন দেবেন না।'

আধঘণ্টা নয়, পুরো একটা ঘণ্টাই অরুন্ধতী ডি সি, ডি ডি-র সঙ্গে ক্লোজড্-ডোর মিটিং করলেন। আগে জানতেন না, আগে শোনেননি, এমন অনেক কথাই শুনলেন। দেবব্রত বসু তাঁকে বলে গেলেন, কী ভাবে রাইটার্স বিল্ডিংসের মত এই লালবাজারেও অফিসার্স পলিটিক্স চলছে। পুলিসের মধ্যেও কি ভাবে রাজনীতি ঢুকে পড়েছে, কী ভাবে সরকারী গোপন তথ্য বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। সবই দেবব্রত বসু অরুন্ধতীকে খুলে বলে গেলেন। বললেন—'ম্যাডাম, গোটা পুলিসেরই এখন অন্য দিকে দৃষ্টি চলে গিয়েছে, ল অ্যাণ্ড অর্ডারের দিকে আগের মত অ্যাটেনশনও পুলিস দিতে পারছে না।'

লিফটের বোমা-রহস্যের কিন্তু কোন কিনারা দেবব্রত বসু বলতে পারলেন না। কিংবা এখনই সব কিছু না দেখেশুনে কিছু বলতে চাইলেন না।

অরুন্ধতী তাঁকে বললেন—'ঠিক আছে মিঃ বসু, আপনি একটা সিক্রেট প্রোব করুন। সাতদিনের মধ্যেই আপনি রিপোর্ট দেবেন।'

ডি সি, ডি ডি বেরিয়ে যেতেই হোম জেনারেলের স্পেশাল অফিসার রমণীবাবু অরুন্ধতীর কাছে কিছু ফাইলপত্র নিয়ে এলেন। পুলিসের জন্য কোয়ার্টার, ক্যালকাটা এবং বেঙ্গল পুলিসের বর্ডার এরিয়ায় কতকগুলি পুলিস আউটপোস্ট তৈরির প্রপোজাল সংক্রান্ত ফাইল নিয়ে কিছু আলোচনা করলেন। রমণীবাবু বললেন—'ম্যাডাম,

চব্বিশ পরগণার ডি এম এবং নর্থের ডি সি বেশ কয়েকবার ফোনে দমদম, কাশীপুর, বরানগর এরিয়ায় বাড়তি পুলিস ফাঁড়ি তৈরির ব্যাপারটা একটু এক্সপিডাইট করতে তাগিদ দিয়েছেন।'

অরুন্ধতী বললেন—'আমাদের এখান থেকে ফাইল মুভ করলেই তো হবে না। আগে স্কিমটা ভাল করে দেখেশুনে ফাইনান্সের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। ওদের সঙ্গে পরামর্শ না করে প্ল্যান সাবমিট করলেই ফাইনান্স স্কিম রিজেক্ট করে ফিরিয়ে দেবে।'

এস ও রমণী চৌধুরী এ-কথা সে-কথা বলার পর এক সময় উঠে পড়লেন। এই সময় অরুন্ধতীর সুইং-ডোর টেনে একটি পরিচিত মুখ উঁকি মারল। অরুন্ধতী দেখলেন, রিপোর্টার অরুণ ব্যানার্জি। ওকে ভিতরে আসতে বললেন।

অরুন্ধতী এখানকার বিশেষ কোন রিপোর্টারকে চেনেন না। তবে অরুণের সঙ্গে তাঁর আগে থাকতেই আলাপ। অরুণ আগে, যখন তাঁর বাবা পশ্চিমবাংলার চীফ সেক্রেটারী, মাঝে-মধ্যে তাঁদের বাড়ি আসত। এখানে পোস্টিং নিয়ে আসার পর অরুণ তাঁর কাছেও এসেছে। কিছু খবর শুনতে চায়। কিছু শুনিয়ে যায়। ওর সঙ্গে যা হোক কিছু খোলাখুলিভাবে অরুন্ধতী কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি সম্পর্কে শুনতে চান।

অরুণ চেয়ারে বসতেই, অরুন্ধতী সুইচ টিপে বনমালীকে ডাকলেন। কফি আনতে বললেন।

আধ ঘণ্টা পর অরুণ চলে যেতেই অরুন্ধতী পাশেই ইনভ্যালিড চেয়ারে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বসলেন। পি এ-কে ফোনে জানিয়ে দিলেন আধ ঘণ্টার জন্য যেন কেউ তাঁকে ডিস্টার্ব না করে। তিনি রেস্ট নিচ্ছেন।

চেয়ারে গা এলিয়ে চোখ দুটো বুজলেন অরুন্ধতী। দিল্লী থেকে পোস্টিং নিয়ে আসার পর একের পর এক ঘটনা তাঁর মনে পড়ল।

একদিকে অফিসিয়াল পলিটিক্স, অন্যদিকে এই ল অ্যাণ্ড অর্ডার প্রবলেম, যেটা তাঁর দায়িত্বে। সব দেখেশুনে অরুন্ধতী যেন সত্যি সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। দিব্যেন্দু দত্তর মত তাঁকেও এক টেনশনের মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে। অফিসারদের এই নোংরা পলিটিক্স, যেখানে সাধারণ কর্মচারীদেরও টেনে আনা হয়েছে। অরুন্ধতী বুঝতে পারছিলেন, শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে এবার ট্রান্সপোর্টের কংস চাকলাদারের একটা কনফ্রনটেশন হবে। তার আঁচও তিনি এরই মধ্যে পেয়েছেন। শুনেছেন, এক্সচেঞ্জ থেকে তাঁর টেলিফোন-গুলোও নাকি আজকাল ট্যাপিং হচ্ছে। কর্মচারীদের একটা জোটই এখন কংস চাকলাদারদের হাতের মুঠোয়।

অরুন্ধতীর মনে পড়ল, এই সেদিন হরিণঘাটার দুধের বোতল চুরির দায়ে বেলগাছিয়ার একটি মহিলা এবং আর দুজন কর্মীকে তিনি সাসপেণ্ড করেছেন। তারপর এমপ্লয়িজদের তরফ থেকে তাঁর কাছে ডেপুটেশন এসেছিল। অরুন্ধতী তাদের স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে তাঁর এখন কিছুই করার নেই। পুলিসের রিপোর্টেই ওদেরকে সাসপেনশনে রাখা হয়েছিল। ওদের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক কেস হয়েছে।

অরুন্ধতী পরে শুনেছিলেন কর্মচারীরা শেষে মিল্ক কমিশনারের কাছে দরবার করেছিল। ক'দিন বেলগাছিয়ার ডেয়ারীতে বিক্ষোভ করেছিল। দুধ সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর সব চুপচাপ।

অরুন্ধতী অবাক হয়ে যান—কত তুচ্ছ, অসঙ্গত সব কারণে আজকাল লোকেরা স্ট্রাইক করে। ট্রেন, ট্রাম-বাস চালানো বন্ধ করে দেয়। আপিস কোর্ট-কাছারীর কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। হাসপাতাল, মিল্ক-সাপ্লাই, বিদ্যুৎ-পর্ষৎ, হরিণঘাটা মিল্ক-ডেয়ারী, সব কাজ অচল হয়ে যায়। অরুন্ধতী ভাবলেন, একদিন হরিণঘাটার দুধ সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে, নব্বই লক্ষের উপর শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, অসুস্থ ব্যক্তির দুধ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া। কলকাতা এবং শহরতলির এগারোটি হাসপাতালে দুধের যোগান বন্ধ হয়ে যাওয়া।

অরুন্ধতী ভাবলেন, গোটা বাংলাদেশের এখন রসাতলে যেতে আর বাকিটা কোথায়। মহাকরণের ভিতরে এবং বাইরে, শহরে নগরে, গ্রামে গঞ্জে, আপিসে আদালতে, স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে, সর্বত্রই যেন এক সৃষ্টিছাড়া অবস্থা। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। পাড়ায় পাড়ায় মারামারি হচ্ছে, বন্দুকে বন্দুকে লড়াই। এ ওকে মারছে তো সে তাকে মারছে। রোজই দশটা-বারোটা করে যুবক শুধু কলকাতার বুকেই খুন হচ্ছে। পুলিস খুন হচ্ছে, নকশাল খুন হচ্ছে, সি পি এম খুন হচ্ছে, কংগ্রেস খুন হচ্ছে। পুলিসের বন্দুক ছিনতাই হচ্ছে। সি আর পি মরছে। জওয়ানও বাদ যাচ্ছে না। কলকাতার উপরই প্রকাশ্য দিবালোকে এ-সব ঘটনার কথা কেউ কোনদিন আগে শোনেনি।

অরুন্ধতী ভাবলেন, পশ্চিম বাংলার আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। দিল্লী এত সব প্ল্যান করছে, প্রাইম মিনিস্টার স্বয়ং পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এত আগ্রহী। এত সব সিক্সটিন পয়েন্ট প্রোগ্রাম হচ্ছে, বন্ধ কল-কারখানা খোলার প্রচেষ্টা হচ্ছে। অথচ কিছুতেই কিছু হবার নয়। এই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে কিছুই হবে না। অরুন্ধতীর ধারণা পলিটিক্যাল পার্টিগুলি ঠিক পথে না চললে কিছুই হবে না। সরকারী আমলারা নিজের স্বার্থ ছেড়ে কাজ করতে এগিয়ে না এলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও ঠিক পথে কাজ করবে না। সব কিছুই ভেস্তে যাবে। নতুন কল-কারখানা হবে না। আপিস-কাছারীতে বেকার যুবকরা চাকরি পাবে না। স্কুল-কলেজে ছেলে-মেয়ে পড়তে পাবে না। দেশে বেকার বাড়বে, এন্টি-সোস্যাল এলিমেণ্টস্ বাড়বে। অবৈধ কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে।

একবার চোখ মেলে তাকাতেই অরুন্ধতী দেখলেন, সামনে দাঁড়িয়ে পি-এ—'ম্যাডাম, দিল্লী থেকে একটা কল আছে।'

অরুন্ধতী চেয়ার থেকে উঠে রিসিভার কানে তুললেন—'হ্যালো।'

ওপাশে প্রাইম মিনিস্টারের সেক্রেটারীয়েট থেকে জয়েণ্ট

সেক্রেটারী কাপুর। কাপুর বললেন, পি এম আসছে সপ্তাহে আসাম যাবার পথে ওয়েস্ট বেঙ্গলে একদিন স্টপ ওভার করবেন। পি এম-এর আগের প্রোগ্রামই স্ট্যাণ্ড করছে। রাজভবনেই অফিসিয়ালস্ এবং অন্যদের মিট করবেন।

অরুন্ধতী ভাবলেন এ ব্যাপারে সি-এসের সঙ্গে কথা বলা দরকার। রিসিভার নামিয়ে রেখেই অরুন্ধতী ইণ্টার-কমে চীফ সেক্রেটারীর ঘরে ডায়াল করলেন—'স্যার, আমি অরুন্ধতী বলছি। একটু আসব?'

চীফ সেক্রেটারী বললেন—'আফটার টেন মিনিটস্। আমি প্রেস মিট করছি।'

সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। মাঝে মাঝেই টিপ-টিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। মাথার কাছে খোলা জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। এমনিতেই শরৎকাল। সকাল-সন্ধ্যা এখন শীত শীত করে। সকালবেলাটায় বিশেষ করে, হাওয়ায় এখন পুজো-পুজো ভাব।

অরুন্ধতী একবার উঠে জানলাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলেন। তারপর আবার শুয়ে পড়লেন। ঘুম-ঘুম ভাবটা এখনও তাঁর ভাল করে কাটেনি।

গতকাল অনেক রাত করে অরুন্ধতী বাড়ি ফিরেছিলেন। বড়দিদের গড়িয়াহাট রোডের বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত ছিলেন। সুব্রতকে দাহ করে যখন লোকজন শ্মশান থেকে ফিরে এসেছে তখন অরুন্ধতী চলে এসেছেন।

মনটা তাঁর একেবারেই ভেঙে পড়েছে। এই সুব্রতর কথা বড়দি-জামাইবাবু তাঁকে কতবার বলেছিলেন। অরুন্ধতী কিন্তু তার জন্য কিছুই করতে পারেননি। পুলিশ সুব্রতকে খুঁজেই পায়নি।

আপিসে বসেই অরুন্ধতী খবরটা পেয়েছিলেন। বড়দি ফোন করেছিলেন। টালিগঞ্জ থানার পুলিস খবর দিয়েছিল, ভোরের দিকে যাদবপুরের কাছে একটা জলার ধারে একটি যুবকের ডেডবডি পাওয়া গেছে, তার পকেটে যে কাগজপত্র ছিল তাতে এই বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে। বড়দিরা শেষে থানায় গিয়েই সুব্রতর বডি আইডেন্টিফাই করেছিলেন।

কালকের ছবিটা অরুন্ধতীর সামনে স্পষ্ট হয়ে উঁকি মারল। ফোন পেয়েই অরুন্ধতী একটা সিকিউরিটি নিয়ে টালিগঞ্জ থানায় ছুটেছিলেন। সাদার্ন এভিন্যুর কাছে টালিগঞ্জ থানার গেটে গাড়ি থেকে নামতেই অরুন্ধতী দেখলেন, বেশ কিছু লোক, বড়দিদের

আত্মীয়-স্বজন অনেকে জটলা করছে। তাঁকে দেখতে পেয়েই সেই জনতার একাংশ শ্লোগান দিল, 'পুলিস এর জবাব দাও, পুলিসের শাস্তি চাই, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।'

ডি সি সাউথ দিলীপ বসু অরুন্ধতীকে স্যালুট করলেন। ভিড়ের মধ্যে তাঁকে এসকর্ট করে নিয়ে গেলেন।

অরুন্ধতী ডি সি-র কাছে জানতে চাইলেন, ব্যাপারটা কি?

ডি সি বললেন—'ম্যাডাম, শেষরাতের দিকে ডেডবডি যাদবপুরের কাছে একটা জলার ধারে পাওয়া গিয়েছে। বডিতে দু-জায়গায় বুলেট-উন্ড্ ছিল। সম্ভবতঃ পাইপগান শট। কিন্তু এরা বলছেন, পুলিসই নাকি একে মেরেছে।

'ভিকটিম কী আপনার কেউ হয় ম্যাডাম?' ডি সি জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, আমার বড়দির ছেলে—' বলে অরুন্ধতী আর কথা বাড়ালেন না। তারপর ডি সি সাউথকে বললেন—'রিলেশানস্ যেন আজই পোস্ট-মর্টেমের পর বডি পেয়ে যায় দেখবেন।'

এর পর অরুন্ধতী সোজা বড়দিদের গড়িয়াহাটের বাড়িতে গিয়েছিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। থানা থেকে পুলিস সুব্রতর নিষ্পাপ দেহটাকে দিয়ে গেলে অরুন্ধতী একবার মাত্র পলকে তাকে দেখেছিলেন। তারপর সেই বুক-ফাটা কান্নার করুণ দৃশ্য থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। বড়দির বাড়িতেও কিন্তু অরুন্ধতীকে দুটো পাড়ার ছেলে জোরের সঙ্গে বলে গেল, পুলিস মার্ডার করেছে। তাদের কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন রয়েছে। অরুন্ধতী তাদেরকে পরে তাঁর সঙ্গে বাড়িতে দেখা করতে বলেছিলেন। কিন্তু সুব্রত কী বিরোধী কোন রাজনৈতিক দল, না পুলিশের হাতের ভিকটিম, সে মৃত্যু-রহস্যের কোন কূলকিনারা পরেও হয়নি।

একটু বাদেই বেয়ারা এসে খবর দিল—'মেমসাহেব, এক জানানা আয়া।'

অরুন্ধতী তাঁকে ওয়েট করতে বলে বাথরুমে ঢুকলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পর অরুন্ধতী নিচে নেমে এসে দেখলেন, মাঝবয়েসী এক মহিলা সোফায় বসে। পাশে ছ-সাত বছরের একটি ছেলে। অরুন্ধতীকে ঘরে ঢুকতে দেখেই মহিলা উঠে দাঁড়ালেন।

ভদ্রমহিলার পরনে চওড়া-পাড়ের শান্তিপুরী শাড়ি, গায় হাত-কাটা ব্লাউজ। চোখে চশমা। বাঁ দিকের গালে একটি পুরো তিল। ফর্সা গালে সহজেই নজরে আসে। ভদ্রমহিলার সিঁথিতে সিঁদুর জ্বল জ্বল করছে। অরুন্ধতী তাঁকে বসতে বললেন।

ভদ্রমহিলা জানালেন, উনি অরুন্ধতীদের পাঁচটা বাড়ির পরই থাকেন। ওঁর স্বামী ইতিহাসের অধ্যাপক, কলকাতার বাইরে এক কলেজে চাকরি করেন। ভদ্রমহিলা জানালেন, গতকাল মাঝরাত্রে পুলিস তাঁদের বাড়ি সার্চ করেছে। তাঁর চোদ্দ বছরের ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। ছেলেটি মিত্র স্কুলে ক্লাস টেনে সায়েন্স নিয়ে পড়ে। কোন পার্টি করে না। স্কুল আর বাড়ি ছাড়া বাইরেও বড় একটা বের হয় না।

ভদ্রমহিলা আরও জানালেন, সি আর পি মশারীর মধ্যে তাঁর ঘুমন্ত বয়স্কা মেয়েদের উপর টর্চলাইট ফেলেছে।

অরুন্ধতী ছেলেটির নাম-ধাম-পরিচয় জেনে নিয়ে তাঁকে চলে যেতে বললেন। বললেন, উনি আপিসে গিয়ে খোঁজ নেবেন।

ভদ্রমহিলা চলে যেতেই অরুন্ধতী খবরের কাগজগুলোর উপর চোখ বোলালেন। সব ক'টা কাগজ দেখে নিয়ে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড তুলে নিলেন। বরাবরই এই হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড অরুন্ধতী পড়ে আসছেন। ওঁর বাবাও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পড়তেন।

কাগজের প্রথম পাতায় দেখলেন প্রধানমন্ত্রীর মস্কো সফরের বিস্তারিত বিবরণ।

নীচের দিকে এরনাকুলামে সি পি আই-এর কনভেনশনের রেজ্যুলেশান।

খুনোখুনির রাজনীতিতে সি পি এম-কে দায়ী করে ধিক্কার দিয়েছে। ওই খুনোখুনি বন্ধে সি পি আই সকল কমরেডদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছে। তার পাশেই ডু'কলম হেডিংয়ে আর একটা ব্যানার নিউজ। কাশীপুরে পুলিসের বন্দুক ছিনতাই। মুণ্ডহীন একটি দেহ পাওয়া গিয়েছে রাস্তার ধারে।

অন্যদিকে অরুন্ধতী চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

অরুন্ধতীর অফিসে পৌঁছতে কিন্তু আজ লেট হয়ে গেল। হাজরা পার্কের কাছে একটা মিছিলে তাঁর গাড়ি আটকে পড়ে গিয়েছিল। বেহালার কোন একটা বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের মিছিল। মিছিলের লোকদের হাতে ফেস্টুন, লাল পতাকা। সকলের হাতে কিন্তু লাঠিসোঁটা। ওরা শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে।

আজকাল একটা নতুন জিনিস অরুন্ধতী লক্ষ্য করেছেন। মিছিলে লোকেরা ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই লাঠিসোঁটা রাখছে। শুনেছেন কেউ কেউ ছুরি-বন্দুকও রাখে। মহরমের সময় যেমন মুসলমানেরা ছুরি-ছোরা লাঠিসোঁটা নিয়ে বের হয়।

চেয়ারে বসেই অরুন্ধতী লালবাজারে সি পি-কে চাইলেন। কিন্তু পুলিস কমিশনারকে পাওয়া গেল না। পি এ-কে বললেন, ডি সি, এস বি ওয়ান তরুণ চ্যাটার্জিকে লাইন দিতে। কিন্তু তরুণ চ্যাটার্জী তখনও আপিসে আসেননি। শেষে ডি সি হেডকোয়ার্টারে বলে সকালের সেই ছেলেটিকে রিলিজ করে দিতে বললেন। বললেন—'যদি দেখেন নির্দোষ তবেই ছেড়ে দেবেন।'

অরুন্ধতী আই বি-র একটা সিক্রেট নোট দেখছিলেন। দিল্লিতে পাঠানো হবে। গেল এক বছরে পশ্চিমবঙ্গের খুনোখুনির একটি

খতিয়ান। কত খুন হয়েছে। কারা খুন হয়েছে। কতজন আটক হয়েছে।

রিপোর্টের উপর চোখ বুলিয়ে অরুন্ধতী দেখতে পেলেন, উনিশ শ' সত্তর সালের উনিশে মার্চ থেকে একাত্তর সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এ রাজ্যে এক হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই জন খুন হয়েছে। তার মধ্যে পাঁচশো ছেচল্লিশটিই রাজনৈতিক মৃত্যু। এঁদের মধ্যে বর্ষীয়ান নেতা ফরওয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত বসুও আছেন। আটক হয়েছে দু'হাজার দু'শো একানব্বই জন নকশালপন্থী।

অরুন্ধতী ভাবলেন, কারা এই নকশালপন্থী? এদের মধ্যে সত্যিকার খুনী কতজন? পুলিস কী সবক্ষেত্রেই ঠিক ঠিক লোককে গ্রেফতার করেছে?

অরুন্ধতীর মনে পড়ল এই মাত্র সেদিন তিনি একবার হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের আই বি আপিসে গিয়ে কিছু ধৃত নকশালদের সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। তাঁর নিজের ইচ্ছে হয়েছিল ওদের সঙ্গে, ওই সব কিশোরদের সঙ্গে, কথা বলে দেখবেন। কী চায় ওরা? কেন এই খুনোখুনির রাজনীতিতে তারা জড়িয়ে পড়েছে?

প্রথমে দেখে অরুন্ধতীর কিন্তু বিশ্বাসই হয়নি ওরা মানুষ খুন করতে পারে। ওদের দেখে অরুন্ধতীর মনে হয়েছিল, সকলেই যেন এক একটি নিষ্পাপ দেবশিশু। ওদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে চেয়েছিলেন। কেউ কেউ মুখ খোলেনি। সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর এড়িয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার জানিয়েছে ওরা আবার সাধারণ জীবনে ফিরে আসতে চায়, মা-ভাই-বোনদের সঙ্গে বসবাস করতে চায়। যদি পুলিস তাদের সে সুযোগ দেয়। অরুন্ধতী নিজেই নিজের মনে প্রশ্ন করেছিলেন, ওদের সে সুযোগ কী একবার দেওয়া যায় না?

অরুন্ধতী শুনেছিলেন, পুলিসের মধ্যে, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে, গভর্মেন্টের ভিতরও নকশালপন্থীরা আছে। অনেক বড়বড় আই এ এস, আই পি এস অফিসারদের ছেলেরাও নকশালদের সমর্থক। সরকারী

বাংলোয় তাদের নিজস্ব বাড়িতে পুলিসের চোখ বাঁচিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ওদের রাখা হয়েছে। অরুন্ধতীর জানতে ইচ্ছে করে, ধৃত সব নকশালদের মধ্যে সেইসব ছেলের সংখ্যা কত?

পি-এ এসে খবর দিলেন—'ম্যাডাম, হোম জি এ থেকে কিছু এমপ্লয়িজ দেখা করতে চাইছে।'

অরুন্ধতী জিজ্ঞেস করলেন—'আমার সঙ্গে, কী ব্যাপার?'

পি-এ বললেন—'কী সব এ-জি ওদের সব ডি এ-র টাকা আটকে রেখেছে। সে সম্পর্কে কথা বলতে চায়।'

অরুন্ধতী বললেন—'তা আমার কাছে কেন? ওদেরকে ডি আই জি-র কাছে যেতে বলুন।'

পি-এ বললেন—'বলেছিলাম। বলছে ওরা গিয়েছিল, কিছু হয়নি। তাই আপনার কাছে এসেছে।'

অরুন্ধতী বললেন—'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিন।'

অরুন্ধতী দেখলেন জনা দশ-বারো কর্মচারী তাঁর ঘরে এসে ঢুকল। ওদের মধ্যে দুটি মহিলাও রয়েছে। অরুন্ধতী ওদের বসতে বললেন। কিন্তু সকলের বসবার জায়গা দিতে পারলেন না। ছ'টা চেয়ারে ছ'জন বসল। বাকিরা দাঁড়িয়ে রইল।

ওদের কাছে অরুন্ধতী জানলেন, হোম জি এ-র কিছু স্টাফ তিন মাস ধরে বাড়তি ডি এ-র টাকা পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে ওরা সব জায়গাতেই দরবার করেছে। হোম ডাইরেক্টরেট থেকে ফিনান্স কমিশনার। কিন্তু কিছু হয়নি। তাই তাঁর কাছে এসেছে। অরুন্ধতী ওদের কাছ থেকে একটা মেমোরেণ্ডামের কপি নিলেন। বললেন—'ঠিক আছে, আপনারা যান, আমি দেখছি।'

অরুন্ধতী ডি আই জি হেডকোয়ার্টারকে লাইন দিতে বললেন। কিন্তু ডি আই জি-কে পাওয়া গেল না। লাঞ্চে গিয়েছেন। অরুন্ধতী এবার ইন্টার-কমে সরাসরি আই জি-র সঙ্গে কথা বললেন। আই জি বললেন, ডিলিং অফিসারকে তাঁর কাছে পাঠাচ্ছেন।

একটু বাদেই অরুন্ধতীর ঘরে এ আই জি মিস্টার এ কে ভাদুড়ী

ঢুকলেন।

অরুন্ধতী তাঁকে স্টাফদের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলেন।

এ আই জি যা বললেন তা হল, প্রিভিয়াস ক্যাবিনেট হোমের কিছু অল্প বেতনের ক্লাস থ্রি এমপ্লয়িজদের ন'টাকা করে এনহান্সড্ ডি এ অ্যাপ্রুভ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা ফর্মাল অর্ডার হয়ে বেরোবার আগেই মিনিস্ট্রি ডিজল্‌ভ হয়ে যায়। তাই ওদের টাকা ফিনান্স আটকে রেখেছে।

অরুন্ধতী জিজ্ঞেস করলেন—'এখন উপায় ?'

এ আই জি বললেন—'ফ্রেস একটা অর্ডার গভর্নরকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে হবে।'

অরুন্ধতী বললেন—'ঠিক আছে। আপনি পেপারস্ রেডি করে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।'

ওঠবার আগে এ আই জি বললেন, 'পুলিসের কোয়ার্টার এবং ফোর্সের ড্রেস তৈরির সেই ফাইলটা ম্যাডাম, ফিনান্স থেকে ফিরে এসেছে। ওরা বলছে পুলিসের জেনারেল ফাণ্ডে টাকা নেই। এমার্জেন্সী ফাণ্ড থেকে সে টাকা স্যাংশান হবে। সেই মতই ফ্রেস স্কিম পাঠাতে বলেছে।'

অরুন্ধতী বললেন—'বেশ তো তাই পাঠান।'

এ আই জি বললেন—'কিন্তু আই জি বলছেন এমার্জেন্সী ফাণ্ড থেকে এ ব্যাপারে টাকা তুলবেন না। ওই টাকা আর্ম অ্যাণ্ড এমুনিশন কিনতে লাগবে। উনি বলছেন চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলবেন।'

শ্রমিকনেতা অতনু রায় এবং পরাশর চক্রবর্তী পরিবহণ কমিশনার কংস চাকলাদারের ঘরে এসে দেখলেন, সি এস টি সি-র চেয়ারম্যান নরহরি দত্ত আগেভাগে এসে রয়েছেন। ওই সময় ঘরে একজন সুবেশা মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। তাকে ওঁরা সকলেই চেনেন। মহাকরণের লিফটম্যান, বেয়ারা, চাপরাশীরা সকলেই চেনে। রাইটার্সের প্রায় সব বড় অফিসারদের ঘরে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়।

ভদ্রমহিলার বয়েস দেখলেই বোঝা যায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। তবু সাজগোজ পোশাকে-আশাকে বয়সটাকে লুকিয়ে রাখতে চান। যৌবনকে ধরে রাখার প্রবল প্রচেষ্টা। ভদ্রমহিলার চোখে রিমলেশ চশমা, ভ্রূ পেন্ট করা। পরনে জরির বুটি দেওয়া শিল্কের শাড়ি। ছোট হাত-কাটা ব্লাউজ। ঠোঁটে পাতলা করে লিপস্টিক দেওয়া। ফর্সা শরীরটায় ফালতু মেদ জমেছে।

ভদ্রমহিলা এক প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রীর বোন, পরে কোন এক ব্যারিস্টারের ঘরনী হয়েছিলেন। কিছুকাল উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের পর নিজেই ব্যারিস্টার স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স নিয়েছিলেন। এখন সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এক সমাজ-কল্যাণ মহিলা সমিতির তিনি সভানেত্রী। তাঁর নাম জয়ন্তী রায়।

অতনু রায় এবং পরাশর চক্রবর্তীকে প্রবেশ করতে দেখে জয়ন্তী রায় উঠে দাঁড়ালেন—'তা হলে আমি চলি কংস। তোমার নিশ্চয় জরুরী মিটিং রয়েছে। তুমি সোমবার আমাদের লটারীর ড্রইং ডে ফাংশনে তা হলে নিশ্চয় আসছ? গভর্নর ঠিক ছ'টায় আসবেন।'

জয়ন্তী রায় বেরিয়ে যেতেই কংস চাকলাদার তাঁর ঘরের সামনের এনগেজড্ বোর্ডটা সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিলেন। বেয়ারা ডোর লক

করে দিয়ে গেল। কংস পি এ-কে বললেন—'আধ ঘণ্টার জন্য কেউ যেন ডিস্টার্ব না করে। বাইরের কোন কানেকশনও দেবেন না। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?'

ওদিকে রাইটার্সের ক্যান্টিন হলে কর্মচারীদের মিটিং বসেছে। টিফিন আওয়ার্সে কর্মী বরখাস্তের প্রতিবাদে সভা। সভায় ঠিক হল এমপ্লয়িজরা প্রত্যেকেই একদিনের স্যালারি সাক্রিফাইস করবে। তাতে একটা জরুরী ফাণ্ড তৈরি হবে—যা থেকে মাসে মাসে তেরো জন ডিসমিসড্ এমপ্লয়িজদের স্যালারি দেওয়া হবে। যে যেমন স্যালারি পাচ্ছিল। আরও ঠিক হয়েছে, আসছে রবিবার শহীদ মিনারে শহীদ দিবসের যে মিটিং হবে, সরকারী কর্মচারীরা তাতে উপস্থিত থাকবে। সেখানেই ফিউচার অ্যাকশন ঠিক হবে। বিরাট ওই ক্যান্টিন হলটা যখন তৈরি হয় অরুন্ধতী তখন কলকাতায়। প্রেসিডেন্সীতে পড়তেন। ওঁর বাবা ওয়েস্ট বেঙ্গলের চীফ সেক্রেটারী, ডাঃ বি সি রায় চীফ মিনিস্টার। অরুন্ধতীর মনে আছে, তার আগে রাইটার্সে কর্মচারীদের জন্য ভাল কোন ক্যান্টিন ছিল না। টিফিন টাইমে রাইটার্সের লোকেরা একে একে বেরিয়ে পড়ত। রাইটার্সের কর্মীরা, যুবক-যুবতী, করণিকরা, অফিসাররা সকলেই। যে যার সাধ্যমত টিফিন করত। কেউ আলুর দম আর রুটি খেত। কেউ খেত চানা-ঝালমুড়ি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেত তারা কাটা পেঁপে, আনারস আর কলা। কেউ আবার রেস্টুরেন্টে চপ কাটলেট চা কফি খেত।

অরুন্ধতী তাঁর বাবার কাছে সে গল্প শুনেছিলেন। একদিন ডাঃ রায়ের ব্যাপারটা চোখে পড়ল। দুপুরে তিনি লাঞ্চ করতে ওয়েলিংটনে যাচ্ছিলেন। লালবাজারের কাছে পরিচিত সব মুখ দেখলেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিফিন করছে। বিকেলে লাঞ্চ সেরে ফিরেই তাঁর চেম্বারে চীফ সেক্রেটারীকে তলব করলেন। বললেন—'তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের চীফ সেক্রেটারী শতদল, তুমি জান তোমার এমপ্লয়িজরা রাস্তা-ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিফিন করে।

ওরা এক জায়গায় বসে দু-দণ্ড কথা বলবে, বিশ্রাম করবে, তার জায়গাটুকু পর্যন্ত তোমার রাইটার্সে নেই। রাইটার্সের ভিতরেই কোথাও একটা বড় ক্যান্টিন হল তৈরি করে দাও। কালই স্কিম করে আমার কাছে প্লেস করবে।'

শতদল সেন দেখলেন ক্যান্টিন করার একটা ওল্ড প্রোপোজাল রয়েছেই। এ ব্যাপারে দু-দিন ডাঃ রায়কে নিজেই বলতে গিয়ে ধমক খেয়েছিলেন। এ সুযোগটা তিনিও ছাড়লেন না। পরদিনই যথারীতি স্কিম ডাঃ রায়ের টেবিলে প্লেস করলেন।

সে স্কিম প্লেস করতেই ডাঃ রায় বলে উঠলেন—'এটা আবার কী এনেছ?'

চীফ সেক্রেটারী বললেন—'স্যার, সেই ক্যান্টিনের ব্যাপারটা।'

'ক্যান্টিন? ওয়েস্ট বেঙ্গল কী আবার ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেণ্টারের মত ঘরে ঘরে ক্যান্টিন খুলছে?'—ডাঃ রায় ধমকে উঠলেন।

শতদল সেন বুঝলেন ডাঃ রায় ব্যাপারটা আগাগোড়াই বেমালুম ভুলে গেছেন। খুলে বলাতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই ফাইলে সই করে দিলেন।

দেখতে দেখতে ক'দিনেই রাইটার্সের ক্যান্টিন হল তৈরি হয়ে গেল। তারপর একদিন ডাঃ রায় নিজেই সে ক্যান্টিনের উদ্বোধন করলেন। সে অনুষ্ঠানে অরুন্ধতীও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারপর অরুন্ধতী এই ক্যান্টিন হলে আর কখনও আসেননি। শুনেছেন, এই ক্যান্টিন হলটাই এখন কর্মচারীদের মিটিং করার প্রশস্ত জায়গা। আজকাল হামেশাই ওখানে এমপ্লয়িজরা মিটিং করছে।

দুটোয় টিফিন আওয়ার্স শেষ হয়ে গেলেও অনেকেই তখন দপ্তরে আসে না। আসতে আসতে তিনটেও বেজে যায়। রিসেপশন থেকে পুনর্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারী সুধাময় মল্লিকের পি এ-কে ফোন করেও পাওয়া গেল না। তখনও টিফিন থেকে ফেরেনি।

মানিকতলা থেকে একদল উদ্বাস্তু প্রতিনিধি এসেছেন, পুনর্বাসন সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে চান। ওদের নেতৃত্ব করছেন একজন প্রাক্তন মহিলা এম এল এ নীলা বসু।

শেষে পুলিস নীলা বসু আর চারজনকে পথ ছেড়ে দিল।

নীলা বসুর সঙ্গে যে চারজন মহাকরণের ভিতর ঢুকলেন তারা সকলেই মাঝবয়সী। দুজন বিবাহিতা। সকলের পরনে আটপৌরে সাধারণ মিলের শাড়ি। ছিটের জামা। পায়ে চটিজুতো। হাতে ছোট বটুয়া। কারও চেহারাই তেমন লক্ষ্য করার মতন নয়। নীলা বসুর অবশ্য শরীরের বাঁধনটা মোটামুটি ভাল। ওর গায়ের রং কালো। তবে চোখ, নাক, মুখ, মোটামুটি সুন্দর।

ওরা উপরে এসে দেখলেন, পুনর্বাসন সেক্রেটারী সুধাময় মল্লিক তখনও লাঞ্চ থেকে ফেরেননি। পি-এ বলতেও পারলেন না ঠিক কখন ফিরবেন। নীলা বসুরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। শেষে পি-এর হাতেই একটা মেমোরেণ্ডামের কপি দিয়ে চলে গেলেন তাঁরা। পি-একে বলে গেলেন, চীফ সেক্রেটারীর কাছে যাচ্ছেন। দু-মাস ধরে মানিকতলার উদ্বাস্তু শিবিরের দেড় হাজারের উপর ছেলেমেয়েরা রিলিফের চাল-ডাল-দুধ পাচ্ছে না। যারাও পাচ্ছে, নামমাত্র পাচ্ছে। বরাদ্দ কোটার সিকিভাগও নয়।

ওরা চীফ সেক্রেটারীর ঘরের কাছে এসে দেখলেন, সামনে এনগেজড্ বোর্ডে আলো জ্বলছে। বেয়ারা বলল, ভিতরে সোমনাথ লাহিড়ী এবং বিশ্বনাথ মুখার্জিরা রয়েছেন। নীলা বসু অরুন্ধতী সেনের ঘরে ঢুকলেন।

অরুন্ধতী তখন টেলিফোনে নিউ সেক্রেটারীয়েটে দিব্যেন্দু দত্তর সঙ্গে কী যেন কথা বলছিলেন। কথা বলতে বলতেই ইশারায় নীলা বসুকে চেয়ারে বসতে বললেন। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে নীলা বসুর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কী ব্যাপার?'

নীলা বসু তাঁর পরিচয় দিলেন। বললেন, তাঁর এলাকায় পুলিস বেপরোয়া অত্যাচার করছে। যাকে-তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

ক্যাম্পের বয়স্থা রিফিউজি মেয়েদের উপর পুলিসের লোক এবং পাড়ার মাস্তানরা অশালীন ব্যবহার করছে। লোকাল থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেও কিছু হয়নি। আরও বললেন, থানার ও সি-ই সব কিছুর মূলে। ওকে সরিয়ে দেবার জন্য বললেন।

অরুন্ধতী সব শুনলেন। কিন্তু কোন কমেন্ট করলেন না। শেষে বললেন—'একটা কাগজে সব অভিযোগ লিখে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন, আমি দেখব।'

নীলা বসু কিন্তু তার আগেই ব্যাগ খুলে রাজ্যপালকে এড্রেস করা একটা মেমোরেণ্ডামের কপি তাঁর টেবিলের উপর রাখলেন।

নীলা বসু বেরিয়ে যেতেই অরুন্ধতী লালবাজারে ডি সি হেডকোয়ার্টারকে লাইন ধরে দিতে পি এ-কে বললেন।

একটু পর টেলিফোন বেজে উঠতেই অরুন্ধতী রিসিভার তুলে নিলেন। ডি সি হেড-কোয়ার্টারকে জিজ্ঞেস করলেন—'যে ছেলেটির কথা বলেছিলাম ছেড়ে দিয়েছেন?'

ডি সি হেড-কোয়ার্টার বললেন—'ইয়েস ম্যাডাম। আরও যে দুজনের কথা আপনি বলেছিলেন, তাদেরও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে অরুন্ধতী আবার ফাইলে মন দিলেন। দ্বিতীয় পাতায় দেখলেন একগাদা নামের লিস্টি। সব বিজনেসম্যান অ্যান্টিসোসালদের নামের তালিকা। ওদের বিরুদ্ধে মিসা অ্যাপ্লাই করা হবে। অরুন্ধতীর মনে পড়ল একমাসও হয়নি তিনশো জনের উপর রেলের স্টোলেন গুডসের ছোট বড় সব রিসিভারদের এই মেনটেনানস্ অফ ইণ্টারন্যাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে আটক করা হয়েছে।

অরুন্ধতী ভাবলেন, এখন তাঁদের হাতে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে পি ভি এ এবং মিসা, মাত্র এই দুটোই অস্ত্র রয়েছে। আপাততঃ কলকাতা মিলিয়ে গোটা রাজ্যে ওই আইনে গ্রেফতারের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। তবে পি ভি এ-র মেয়াদ ফুরোতে আর মাত্র ক'টা মাস। তারপরই হাজার হাজার সব অপরাধী খুনীদের ছেড়ে দিতে

হবে। তখন বাংলাদেশের হালটা কী হবে। প্রিভেনশন অফ ভায়োলেন্ট অ্যাকটিভিটি অ্যাক্ট-এর অলটারনেটিভ একটা কিছু অবশ্যই তাঁদের পেতে হবে। না হলে খুনী চোর বদমায়েসদের ছেড়ে দিতে হবে। ওদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাবে। সাধারণ লোক কলকাতায় আর বসবাস করতে পারবে না। দিল্লীতে অবশ্য এ ব্যাপারে গভর্নর নিজেই লিখেছেন।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক এগারোটায় অরুন্ধতী গভর্নরের এ ডি সি ক্যাপ্টেন সেনের সঙ্গে দোতলায় মিটিং-রুমে ঢুকলেন। এগারোটা পনেরোয় রাজ্যপালের সঙ্গে মিটিং। মিটিংয়ে থাকছেন চীফ সেক্রেটারী, আই জি, কমিশনার অফ পুলিস এবং হোম সেক্রেটারীর অবর্তমানে জয়েণ্ট সেক্রেটারী ফর হোম অরুন্ধতী সেন। এই প্রথম নতুন রাজ্যপালের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত এক জরুরী মিটিংয়ে অরুন্ধতীকে ডাকা হয়েছে। হোম সেক্রেটারী অসুস্থ। ছুটিতে রয়েছেন। তাই অরুন্ধতী এসেছেন।

অরুন্ধতী দেখলেন মিটিংরুমে চীফ সেক্রেটারী ছাড়া আর সকলেই উপস্থিত। রাজ্যপাল ভগবান দাসও আসেননি। একটু পরেই আসবেন।

অরুন্ধতী ভাবলেন, আবার সেই কতদিন বাদে এই রাজভবনে তাঁর ঢোকা। একটু আগেই পাথর-বিছানো পথের উপর দিয়ে তাঁর গাড়ি রাজভবনের পোর্টিকোতে প্রবেশ করেছে। মার্বেল প্লেস, থ্রোন-রুম পেরিয়ে লিফট দিয়ে উপরে ওঠবার সময় তাঁর সেই পুরনো দিনের স্মৃতি মনে পড়েছে। আগেও বেশ কয়েকবার তিনি এই রাজভবনে এসেছেন একজনের কাছে। কখনও তাঁর ডাকে, কখনও নিজের তাগিদে।

তখন তিনি ছাত্রী। প্রেসিডেন্সীতে পলিটিকাল সায়েন্সে অনার্স নিয়ে পড়ছেন। অরুন্ধতীর মনে পড়ল, এই রাজভবনেই একদিন নিখিলেশের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ। অরুন্ধতী তাঁর বাবার সঙ্গে ইণ্ডিপেনডেন্স-ডে'র একটা ফাংশনে এসেছিলেন। সেদিনই প্রথম বি সি রায়কে সামনাসামনি দেখেছেন। ডাঃ রায় নিজেই তাঁর সঙ্গে ডেকে কথা বলেছেন। জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।

পরে একদিন বিধানজ্যেঠুর মুখেই গল্প শুনেছিলেন। মারকুইস

অফ ওয়েলেসলী তখন গভর্নর-জেনারেল। কলকাতায় এসে লাটসাহেবের বাড়ি দেখে ভ্রূ কোঁচকালেন। পরদিনই লণ্ডনে তার পাঠালেন।—এ তোমরা করেছ কি, এ কী লাটসাহেবের বাড়ির দশা! না খোলামেলা, না আছে আলো-বাতাস, না আছে পা মেলবার জায়গা। এ যে দম বন্ধ হয়ে মরবার উপক্রম। না বাপু, আমি এখানে থাকতে পারব না।

নতুন লাটভবন তৈরির পারমিশন দাও। না হয় আমায় ফিরিয়ে নাও। এখানে অঢেল জায়গা রয়েছে। লাটভবন আমিই করিয়ে নিচ্ছি। তাছাড়া তোমরা এখানে এসে দেখে যাও, ডাচ, পর্তুগিজ, ফরাসীরা কী রকম হাসাহাসি করছে তোমাদের লাটসাহেবের বাড়ির বহর দেখে।

ঠিক কথা। এ তো সমস্ত ইংরেজ জাতিরই অপমান। শাসকবর্গের আঁতে ঘা লাগল। পরের ডাকেই নতুন লাটভবন তৈরির পারমিশন এসে গেল।

অল রাইট, ইউ ক্যারি অন্।

সে সতেরো শ' নিরানব্বুই সালের কথা। পাঁচই ফেব্রুয়ারী নতুন লাটভবন তৈরির কাজ শুরু হল। ইংলণ্ড থেকে এলেন এক নামী আর্মি এঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন ওয়াট। আঠারোশো তিন সালের শুরুতেই লাটসাহেবের বাড়ি তৈরির কাজ সারা। খরচ পড়ল মাত্র বিশ লাখ টাকা। সাতাশে জানুয়ারী এক অনুষ্ঠানে রাজভবনের গৃহপ্রবেশ হল। ওয়েলেসলী সাহেব রাজভবনে ঢুকলেন। পুরনো বাড়ি, যেটায় এখন ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ছোট লাটসাহেবের জন্য রইল।

রাজভবনের সেই অনুষ্ঠানে ধুমধাম অনেক হয়েছিল। খুব খানাপিনা নাচগান হয়েছিল। গণ্যমান্য নামী দামী ব্যক্তির সবাই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরও নাকি সে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

একটু বাদেই গভর্নর ভগবান দাস মিটিংরুমে এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছু পিছু এলেন ফাইল হাতে গভর্নরের সেক্রেটারী এবং এ ডি সি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দরজা দিয়ে ঢুকলেন চীফ সেক্রেটারী সব্যসাচী বসু। ওঁরা সবাই উঠে দাঁড়ালেন।

'আপকা তবিয়ত কেইসা, আচ্ছা হায়?'—হাসতে হাসতে সোফায় বসলেন রাজ্যপাল ভগবান দাস।

ওঁরাও সকলে একে একে আবার যে যার জায়গায় বসলেন। রাজ্যপালের সেক্রেটারী, এ ডি সি কিন্তু দাঁড়িয়েই রইলেন। এই নাকি প্রথা। যতক্ষণ না রাজ্যপাল ওঁদের বসতে বলবেন, ওঁরা দাঁড়িয়েই থাকবেন।

মিটিংয়ের অ্যাজেণ্ডার উপর চোখ বুলোতে বুলোতে রাজ্যপাল চীফ সেক্রেটারীকে জিজ্ঞেস করলেন—'হোয়াট অ্যাবাউট এমপ্লয়িজ অ্যাজিটেশন ইন দি সেক্রেটারীয়েট?'

চীফ সেক্রেটারী বললেন—'পিসফুল স্যার।'

রাজ্যপাল প্রশ্ন করলেন—'ডু ইউ থিংক এমপ্লয়িজ উইল গো ফর ফারদার মুভমেণ্ট?'

চীফ সেক্রেটারী বললেন—'মোস্ট প্রব্যাবলি নট। দে ওন্ট ডেয়ার টু ডু সো।'

রাজ্যপাল হেসে বললেন—'বহুৎ আচ্ছা। দেন ইউ মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট ছাট্ আই হ্যাভ্ রেকমেনডেড্ দ্য রাইট থিং অ্যাট দ্য রাইট মোমেণ্ট।'

আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উইক্‌লি রিপোর্ট পড়তে পড়তে রাজ্যপাল সি পি-র দিকে তাকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন—'আপকা কাম আচ্ছা নেই। ইউ আর নট্ ডুইং ওয়েল মিঃ স্যানিয়াল। দিস্ ইজ্ রিগ্রেটেবল ছাট দি হুলিগানস্ ষ্টিল রুল দ্য সিটি। আজ ভি কুছ ইনসিডেণ্ট হুয়া।'

সি পি বললেন—'স্যার, আমরা তো যথেষ্ট এফর্টস দিচ্ছি। এ পর্যন্ত ওভার সেভেনটি পুলিসকে আমরা মিসক্রিয়েণ্টদের হাতে লস্ট

করেছি। স্টিল পুলিসের মরাল হাই। স্যার, যদি আমাদের আর একটু ফ্রি হ্যাণ্ড দেওয়া হয়, আর উপর থেকে ইণ্টারফিয়ারেন্স না আসে, উই ক্যান সল্‌ভ দি প্রেজেণ্ট ল অ্যাণ্ড অর্ডার প্রব্‌লেম উইদিন এ ফর্টনাইট।'

রাজ্যপাল অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'হোয়াট ইজ ইওর অ্যাসেসমেণ্ট অফ্‌ প্রেজেণ্ট ল অ্যাণ্ড অর্ডার সিচুয়েশন মিস সেন?'

অরুন্ধতী বললেন—'আমার মনে হয় স্যার, আমাদের কতকগুলি স্পেসিফিক ড্র-ব্যাক রয়েছে যার জন্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি সল্‌ভ হতে পারছে না। পুলিসের মধ্যে বড় বেশি পলিটিক্স ঢুকে গেছে। পুলিসের একাংশের সঙ্গে আণ্ডার-ডগদের যোগাযোগ রয়ে গেছে। তাই কোথাও পুলিস অ্যাকশন হবার আগেই মিসক্রিয়েণ্টরা পালিয়ে যাচ্ছে।'

রাজ্যপাল চীফ সেক্রেটারীকে প্রশ্ন করলেন—'হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস অবজারভেশন অফ ইওর ইয়ং কলিগ? আপ ভি কুছ বাতাইয়ে।'

চীফ সেক্রেটারী বললেন—'মোস্টলি কারেক্ট স্যার। আমি ডি আই জি. আই বি-কে এ ব্যাপারে একটা সিক্রেট এনকোয়ারি করতে বলেছি।'

রাজ্যপাল বললেন—'দ্যাটস্‌ গুড।' তারপর আই জি-র দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন—'আপনার অবজারভেশন মিঃ চ্যাটার্জী?'

আই জি তারানন্দ চ্যাটার্জী বললেন—'স্যার, আমার মনে হয় গত কয়েক বছরে পলিটিক্যাল পার্টিগুলি যে ভাবে পুলিসকে ট্রিট করেছে তাতে লোকের মনে আজ পুলিস-ভীতিটা একেবারে কমে গেছে। সেটা ফিরিয়ে আনতে না পারলে পরিস্থিতির তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে না। এখন লোকে পুলিসের চেয়ে ক্রিমিনালদের বেশি ভয় পায়। সেটা পাল্টাবার জন্য পুলিসকে একটু রিপ্রেসিভ মেজার নেবার পারমিশন কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ দিতে হবে। তা হলেই

ল অ্যাণ্ড অর্ডার সিচুয়েশন ইমপ্রুভ করবে। যেমন স্যার আমরা ডেবরায় করেছি, গোপীবল্লভপুরে করেছি, নকশালবাড়িতে নকশাল অপারেশনের সময় করেছি।'

রাজ্যপাল বললেন যে, তিনি কিন্তু এক পলিটিক্যাল লিডারের কাছে শুনেছিলেন যে, যেদিন থেকে পুলিসের লালপাগড়ি উঠিয়ে দেওয়া হল, সেদিন থেকেই লোকের মনে নাকি পুলিস-ভীতি কমে গেছে। আর তারপর থেকে ল অ্যাণ্ড অর্ডার সিচুয়েশন ডেটিরিওরেট করেছে।

শেষ পর্যন্ত প্রায় একঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের মিটিংয়ে স্পেসিফিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, পুলিসের মধ্যে থেকে, কর্মচারীদের মধ্যে থেকে পলিটিক্যাল এলিমেন্ট উইড আউট করতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় এরিয়া করে আর্মি দিয়ে মাস কুম্বিং অপারেশন করে অ্যান্টি-সোসালদের ধরতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে পুলিসকে ফ্রি হ্যাণ্ড দিতে হবে। তবে সে ক্ষমতার যাতে অপব্যবহার না হয় সে জন্যে সব সময় একজন সিনিয়র অফিসারের পারমিশন নিতে হবে। আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, ক্যালকাটা এবং বেঙ্গল পুলিসের লোকদের নিয়ে একটা জয়েন্ট সেল খোলা হবে। যার কাজ হবে সপ্তাহ অন্তর একত্র বসে ক্রাইম পোজিশন চেক করা। ল এণ্ড অর্ডারের ট্রেণ্ড লক্ষ্য রাখা। দিল্লী এবং রাজ্যপালকে টাইম টু টাইম সে কথা জানানো। সাজেশন দেবে এবং চাইবে। হেলপ্ চাইবে। আর ওই সেলের চার্জে থাকবেন জয়েন্ট সেক্রেটারী হোম অরুন্ধতী সেন।

আগেই ঠিক করা ছিল, অরুন্ধতী দিব্যেন্দুকে নিউ সেক্রেটারীয়েটের তলা থেকে তুলে নেবেন। সেটা অরুন্ধতী এবং দিব্যেন্দু নিজেরাই কথা বলে ঠিক করে নিয়েছিলেন। বিকেল পাঁচটা দশে প্লেন ল্যাণ্ড করবে। রাজ্য সরকারের পক্ষে ওঁরা এয়ারপোর্টে যাবেন জাপানের এক ট্রেড ডেলিগেশনকে রিসিভ করতে। চীফ সেক্রেটারী বলেছিলেন দুজনকেই যেতে। অবশ্য বিভিন্ন চেম্বারের প্রতিনিধিরা এবং কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পপতিরাও থাকবেন।

লিফটে করে নীচে নেমে এলে সেণ্ট্রাল স্টেয়ারকেসের সামনে পুলিস তাঁকে স্যালুট করে দাঁড়াল। নীল অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা অরুন্ধতীকে নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে বেরোতেই অরুন্ধতী ড্রাইভারকে বললেন—'নিউ সেক্রেটারীয়েট হো কর চল।' ড্রাইভারও ডানে হেয়ার স্ট্রীটের দিকে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘোরাল।

গাড়ি ময়দানের কাছে আসতে দু'দিক থেকে দুটো মিছিল রাস্তা রোধ করে দিল। ড্রাইভার কিন্তু গাড়ি ব্যাক করে হাইকোর্ট ঘুরে মিশন রোতে পড়ল। চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে পৌঁছতেই আবার সেই মিছিল। মিছিল চলেছে ময়দানের দিকে।

হাতে লালঝাণ্ডা, ফেস্টুন, লাঠি নিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে প্রোসেশন এগিয়ে চলেছে। শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। আমাদের দাবি মানতে হবে! কর্মচারীদের ছাঁটাই আদেশ তুলে নাও! তুলে নাও! ভগবান দাস গো ব্যাক, গো ব্যাক! মিছিলে অনেক নারীও আছে। ময়দানের শ্রমিক দিবসের সভায় মিছিল চলেছে।

বেশ কিছুক্ষণ সব রাস্তা বন্ধ। একটার পর একটা সব গাড়ি দাঁড়িয়ে। দিব্যেন্দু অরুন্ধতীকে বললেন—'এই একটা উপদ্রব হয়েছে ভাল। রোজ রোজ কলকাতার রাস্তায় প্রোসেসন। নকশালরা এই সব প্রোসেশনে বোমা ফাটাতে পারে না!'

দিব্যেন্দু হেসে কথাগুলো বললেও অরুন্ধতী কিন্তু কপট ভর্ৎসনা করলেন—'এই তো যা হোক ক্লাস ওয়ান গভর্নমেণ্ট অফিসারের মত কথা বলছ। সত্যি, গভর্নরের উচিত আজই তোমাকে হোম সেক্রেটারীর পোস্ট দিয়ে দেওয়া।' বলার শেষে অরুন্ধতীও হেসে ফেললেন।

দিব্যেন্দু বললেন—'আমি উইথড্র করছি আমার আগের ওয়ার্ডস্। সত্যি বিশ্বাস কর অরুন্ধতী, আজকে আপিস আসার পথে দেড় ঘণ্টার উপর ঠিক এসপ্লানেডের কাছে এসে প্রোসেশনের পেছনে ডিটেন্ড্ হয়েছিলাম। ওখান থেকে রাস্তা পেয়ে চৌরঙ্গীর দিকে এগোতেই ময়দানের কাছে আবার মিছিল। ক্লোজড্-ডাউন ফ্যাক্টরীর সব কর্মীদের মিছিল।'

অরুন্ধতীও সায় দিলেন—'হ্যাঁ, কলকাতায় মিছিলের সংখ্যা বেড়েই গিয়েছে। কলকাতার কতকগুলি জায়গায় পারমানেণ্ট ওয়ান-ফর্টিফোর দেওয়ার প্রপোজাল গভর্নমেণ্টের কাছে রয়েছে।'

ওরা বাংলায় বলছিলেন। হিন্দুস্থানী ড্রাইভার বুঝতে পারছিল না ওঁদের কথা। তবে কান দুটো সতর্ক রেখেছিল।

কিছুক্ষণ বাদেই মিছিল চলে গেলেই আবার গাড়ি ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। কিছুটা এগোতেই ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ড্রাইভার অরুন্ধতীর নির্দেশে স্পীড বাড়িয়ে দিল।

গাড়ি বেলেঘাটার কাছে আসতে ওঁরা দেখলেন পর পর লাইন বেঁধে কয়েকটা স্টেটবাস উল্টোদিকে ছুটছে। প্রত্যেক ক'টা বাসের সামনে গ্যারেজ লাগানো। কিন্তু প্রত্যেক ক'টা বাসের মধ্যেই লোক ভর্তি। দূর থেকেই ওরা দেখতে পেলেন, লোকগুলোর চেহারা সাধারণ মানুষের মত নয়। উস্কোখুস্কো চুল, নোংরা জামা গায়ে, কারও গায়ে শুধু গেঞ্জি। লাল ফেসটুন, পতাকা সহজেই চোখে পড়ছিল। বাসের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ শ্লোগান দিচ্ছিল, 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ! আমাদের দাবি মানতে হবে!'

দিব্যেন্দু এবং অরুন্ধতী পর পর পাঁচটা এ রকম বাস যেতে

দেখলেন। অরুন্ধতী কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। দিব্যেন্দু একবার মুখটাকে অরুন্ধতীর একেবারে কানের কাছে নিয়ে হেসে আস্তে বললেন—'কংস চাকলাদার জিন্দাবাদ!'

ওরা যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছলেন, পাঁচটা বাজতে মিনিট চারেক বাকি। এসেই শুনলেন ফ্লাইট আটাশ মিনিট লেট। দুজনে ভি আই পি রুমের দিকে গেলেন।

জাপ এয়ারলাইনসের বোয়িং যখন ইন্টারন্যাশানাল রানওয়ের কাছে ল্যাণ্ড করল, অরুন্ধতীরা গাড়ি নিয়ে রানওয়ের ভিতর ঢুকে গেলেন। এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি কনট্রোলের ডি এস পি মিঃ ওয়েবস্টার তাঁদের এসকর্ট করে নিয়ে গেল।

এয়ারক্রাফট দু-চক্কর রানওয়ে ঘুরে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াল। সিঁড়ি লাগিয়ে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ বাদেই দোর খোলা হলে প্যাসেঞ্জাররা একে একে নেমে এলেন। একেবারে শেষে নামলেন জাপানীজ ট্রেড ডেলিগেশন।

ডেলিগেশনের লিডার ওসাকোকা এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে অরুন্ধতী এবং দিব্যেন্দুর পরিচয় করিয়ে দিলেন কলকাতার জাপান কনস্যুলেটের চীফ ইবেদা। ওঁদের করমর্দন হল।

অরুন্ধতী দেখলেন, কোথা থেকে কলকাতার কাগজের একদল বিমান-বন্দরের সংবাদদাতারা প্রতিনিধিদের ঘিরে ধরলেন। অরুন্ধতী এদের কাউকেই রাইটার্সে আগে দেখেননি।

সংবাদদাতারা ডেলিগেশনের লিডার ওসাকোকাকে বললেন—'আমাদের কিছু বলুন, আপনাদের এ আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দু-চার কথা বলুন।'

ওরা প্রশ্ন ইংরেজীতে করলেন। কিন্তু ওসাকোকা ইংরেজী না জানায় দোভাষী তার অনুবাদ করে দিলেন। তার উত্তরও রিপোর্টারদের ইংরাজীতে বুঝিয়ে বললেন।

জাপানের এই ট্রেড ডেলিগেশন শুধু ব্যবসার উদ্দেশ্য নিয়েই এ দেশে এসেছে মনে করলে ভুল করা হবে। তাঁদের এ সফরের প্রধান উদ্দেশ্য হল জাপান ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও দৃঢ়তর করা। দুটি দেশকে আরও কাছে এগিয়ে আনা। এ তাঁদের মৈত্রী-সফর।

ওসাকোকা বললেন, তাঁরা চান ভারতের শিল্প আরও প্রসারিত হোক। কলকারখানা আরও বাড়ুক। শিল্পে ভারত স্বয়ংসম্পন্ন হোক। তাঁরা এদেশে এসেছেন কী ভাবে শিল্প-প্রসারে ভারতকে সাহায্য করতে পারেন সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে।

একজন সংবাদদাতা জিজ্ঞেস করলেন—'জাপান কী ভারতে টয়ওটা ধরনের গাড়ি তৈরির কোন কারখানা করার কথা ভাবছে?'

ওসাকোকা বললেন, কোন সিদ্ধান্ত তাঁরা নিজেরা একা নিতে পারেন না। আগে সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। তারপর তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে টয়ওটা কেন, যে-কোন গাড়ি তৈরির কারখানা এদেশে খুলতে পারলে জাপান সরকার খুশীই হবেন।

ডেলিগেশন টিমের লোকেরা পায়ে পায়ে লাউঞ্জের বাইরে বেরিয়ে এলেন। পাশে পাশে এলেন জাপানী কনসাল, চেম্বারের সব প্রতিনিধি এবং অরুন্ধতীরা। আস্তে আস্তে ওঁরা গাড়িতে উঠলেন। গাড়িতে ওঠার আগে ওঁদের আর একবার করমর্দন হল। এরই মধ্যে এক ফাঁকে জাপানী কনসাল অরুন্ধতীদের জানালেন, সোমবার গ্র্যাণ্ড হোটেলে সন্ধ্যা ছ'টায় প্রতিনিধিদের সম্মানে একটা ককটেল দেওয়া হচ্ছে। ওঁরা যেন অবশ্যই যান। ইনভিটেশনের ফর্মাল চিঠি ইতিমধ্যেই চলে গিয়ে থাকবে।

কথামত ফেরার পথে অরুন্ধতীর গাড়ি বালিগঞ্জ সারকুলার

রোডের গভর্নমেন্ট কোয়াটার্সে দিব্যেন্দুকে নামিয়ে দিতে এলে ওরা দেখতে পেলেন, সামনে দিয়ে একটা গাড়ি কৃষি-দপ্তরের ডাইরেক্টর ডঃ কল্পতরু ঘোষ পাশে বসা সি এস টি সি-র চেয়ারম্যান নরহরি দত্তর মেয়ে সুনন্দাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। দিব্যেন্দু অরুন্ধতীকে এক রকম জোর করেই তাঁর ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন।

দোতলায় উঠে দিব্যেন্দু পকেট থেকে চাবি বের করলেন। ঘর খুলে ভিতরে ঢুকেই জানলা খুলে দিলেন। জানলা খুলতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঘরের ভিতর ঢুকে বদ্ধ আবহাওয়া কাটিয়ে দিল।

অরুন্ধতী ঘরের ভিতর চোখটা একবার বুলিয়ে নিলেন। একদিকে খাটের উপর বিছানার চাদর ওলট-পালট। বিছানার উপরে হ্যারল্ড রবিন্সের 'কার্পেট-ব্যাগার্স'। আধ-খোলা অবস্থায় পড়ে। কাছেই একটি ছোট টেবিলের উপর অ্যাশট্রে। পোড়া সিগারেট এবং ছাইয়ে ভর্তি। পাশেই একটা কাঁচের গ্লাসে তলানি কিছুটা ড্রিংকস্ পড়ে। টেবিলের নীচে একটি ব্ল্যাক নাইটের খালি বোতল। ছিপি-খোলা অবস্থায় ছুটো সোডা। একটা প্রায় ভর্তি। দূরে আলনার উপর কিছু জামাকাপড়। অগোছাল অবস্থায়। আর একদিকে বড় একটা টেবিল। টেবিলের উপর টাইমপিস। কিছু কাগজপত্র। ওদিকে বেতের ক'টা চেয়ার। গোল টেবিল। ঘরের এক পাশে একটা ফ্রিজ। বড় ঘরের ছু'দিকে ছুটো সিলিং পাখা, ছুটো বড় লাইট, একটা হ্যাণ্ডার দেওয়া ঝোলানো ডুম বাতি।

ঘরের এই হাল দেখে দিব্যেন্দুর নিজেরই কেমন লজ্জা করতে লাগল। অরুন্ধতীকে চারপাশে তাকাতে দেখে তারও চোখ খুলে গেল। বুঝলেন, এই ভাবে এই পরিবেশে অরুন্ধতীকে আনা ঠিক হয়নি।

দিব্যেন্দুর মনে পড়ল গতকাল রবিবার ছিল। হাওড়ার এস পি অমল দত্ত এসেছিল। ওরা একই বছরে ছুজনে সারভিসে এসেছে। ছুজনের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা। অমলই আসবার সময় ড্রিংকস্টা কিনে এনেছিল।

আজ ভোরবেলাই দিব্যেন্দু চাবি পকেটে করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। চেম্বারের এক ফাংশন ছিল। ওখান থেকেই আপিসে এসেছিলেন। আসবার সময় চাবিও পকেটে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। দিব্যেন্দু ভাবলেন নিশ্চয় ঝাড়ুদার বেয়ারা ঘর পরিষ্কার করতে এসে তার জন্য অপেক্ষা করে নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে।

দিব্যেন্দু নিজেই ঘরদোর ঠিকঠাক করতে এগিয়ে গেলেন।

'ঢের হয়েছে—', বলে অরুন্ধতী তাকে এক রকম ঠেলে সরিয়ে দিলেন। তারপর নিজেই বিছানাপত্র ঘরদোর ঠিকঠাক করে গুছিয়ে রাখলেন। ঘরদোর পরিষ্কার করে অরুন্ধতী বাথরুম থেকে ঘুরে এসেই দেখলেন, দিব্যেন্দু বোতল থেকে ঠাণ্ডা বিয়ার টেবিলে রাখা দুটো কাঁচের গ্লাসে ঢালছেন। অরুন্ধতীর দিকে চোখ পড়তেই পিটি পিটি হাসলেন।

অরুন্ধতীর সত্যি তেষ্টা পেয়েছিল। ফ্রিজের বরফকুচি কয়েকটা গ্লাসে ঢেলে দিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে লাগলেন। দিব্যেন্দু কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই গ্লাস খালি করে আবার বিয়ার ঢালতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরই দিব্যেন্দুর একটু নেশা নেশা লাগল। অরুন্ধতীরও। দিব্যেন্দু অরুন্ধতীর কাছে এগিয়ে এলেন।

অরুন্ধতী বললেন—'চলো দিব্যেন্দু, আজকে বাইরে কোথাও দুজনে খেয়ে নিই।'

দিব্যেন্দু ঘাড় নেড়ে ইশারায় সায় দিলেন।

দিব্যেন্দুর ইচ্ছে হলো অরুন্ধতীকে একটা চুমো খায়। দিব্যেন্দু অরুন্ধতীর মুখের কাছে নিজের মুখটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

ঠিক এই সময় বাইরে দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই দিব্যেন্দু সামনে দেখলেন অরুন্ধতীর ড্রাইভার লালতা সিং —'আউর কিত্‌না দের সাব?'

'আভি যানা'—বলে দিব্যেন্দু ধপাস করে লালতা সিংয়ের মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

পরদিন সকালে গোটা কলকাতা শহরটাই যেন আর একবার চমকে উঠল। সব ক'টা কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে সে খবর ছাপা হয়েছে। পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, চায়ের দোকানে, পাড়ার রকে, চৌ-রাস্তার মোড়ে সর্বত্র সকলের মুখেই সেই কথা। এ রকম বীভৎস, লোমহর্ষক খবর কলকাতার লোকে বহুদিন বাদে আবার শুনল। গত বছর একুশে নভেম্বরের কাগজগুলোয় ঠিক এ রকম খবরই একবার ছাপা হয়েছিল। সেই বারাসতে যশোর রোডের ধারে যেবার নয়-নয়টা যুবকের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

অরুন্ধতীও খবরটা কাগজে দেখলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন। গতকাল মাঝরাত্রে বরানগরে ডানলপ ব্রিজের কাছে একটা জলার ধারে একসঙ্গে ছ'টা বডি পাওয়া গিয়েছে। ওই ছ'জনের মধ্যে দুজন নারী। সকলেরই বয়স আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে। সকলের শরীরে একাধিক গুলির দাগ। সকলেরই হাত-পা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। বডিগুলির কাছে কয়েকটা খালি কার্তুজ পাওয়া গেছে।

অরুন্ধতী দেখলেন, বারাসত আমডাঙার সেই ঘটনার সঙ্গে এ ঘটনার অদ্ভুত মিল রয়েছে। দেখলেন, কাগজে সময় দেওয়া হয়েছে রাত্রি একটা থেকে দেড়টার মধ্যে কলকাতাগামী এক ট্রাক-চালক প্রথমে বডিগুলো পড়ে থাকতে দেখে। তারপরই বরানগর থানায় গিয়ে রিপোর্ট করে।

অরুন্ধতীর মনে পড়ল বারাসাতের সেই ঘটনার কূল কিনারা এখনও কিছু হয়নি। একটি বিচার-বিভাগীয় তদন্ত হবার কথা ছিল। হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি টি পি মুখার্জীকে দিয়ে তদন্ত করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। খবরের কাগজে সে খবরও

বেরিয়েছিল। কিন্তু তারপরই একদিন মিস্টার মুখার্জি লেকের ধারে বেড়াতে গিয়ে ছুরিকাহত হলেন, একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন মাত্র। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের চাপে সে তদন্তের ভার আর নিলেন না। তারপর থেকে শুধু বিচারকের অভাবেই সে তদন্ত চাপা পড়ে গেল। কোন বিচারপতিই সে তদন্ত করতে রাজী হলেন না।

পুরো এক বছরও হয়নি সে ঘটনা। আবার তার পুনরাবৃত্তি। অরুন্ধতী ভাবলেন, এ পুরো গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধেই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। গোটা পুলিসের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীদের একটা ওপেন চ্যালেঞ্জ।

কাগজের প্রথম পাতাতেই আরও দুটো খবরের প্রতি অরুন্ধতীর দৃষ্টি পড়ল। দমদম সেণ্ট্রাল জেলে থেকে পনেরো জন বিচারাধীন নকশালপন্থী যুবক উধাও। জেল ভেঙে তারা পালিয়েছে। পরে অবশ্য পুলিস আটজনকে আটক করেছে।

অরুন্ধতী ভাবলেন, এই একটা নতুন নিত্যকার ফিচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জেল ভেঙে পালানোর ব্যাপারটা। হিসেব করে দেখলেন গত দুই মাসে এ রকম পাঁচ-পাঁচটা জেল ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। কলকাতায়, আলিপুরে এবং দমদমেই তিনটি। বাকি দুটোর একটি হয়েছে মেদিনীপুর জেলে, অপরটি বহরমপুরে। পুলিস তিনটি ক্ষেত্রে অবশ্য গুলি চালিয়েছে। কারারক্ষীরা বাধা দিয়েছে। তাতে সংঘর্ষ হয়েছে। কয়েদী মরেছে। কারারক্ষীরা আহত হয়েছে। কয়েদীরা লাঠি-সোঁটা, ছোরা, লোহার রড, পাথর নিয়ে কারারক্ষীদের আঘাত করেছে। আর কারারক্ষীরা গুলি ছুঁড়েছে।

অরুন্ধতী ভাবলেন, এই কয়েদীরা জেলের ভিতর ছুরি-ছোরা, লাঠি পায় কী করে? নিশ্চয় ভিতরের কিছু লোকের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ রয়েছে। জেল প্রশাসন বলতে আর কিছু রইল না। শুধু জেল কেন, গোটা পশ্চিমবঙ্গে আজ আর প্রশাসন বলে কিছু আছে? অরুন্ধতী নিজেকেই এ প্রশ্ন করলেন।

অরুন্ধতী কাগজের অন্য আর একটা খবরের দিকে দৃষ্টি দিলেন। কালকের সেই শহীদ দিবসের মিটিংয়ের রিপোর্ট। প্রথম পাতার এক কোণে সে রিপোর্ট বেরিয়েছে। শ্রমিকনেতা অতনু রায় এবং পরাশর চক্রবর্তীর বক্তৃতার কিছু অংশও ছাপা হয়েছে—যেখানে সরকারকে এবং অফিসারদের গালিগালাজ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ওই সব অফিসারদের জন্যই পশ্চিমবঙ্গের এই দশা। সমস্ত প্রশাসন কাঠামো ভেঙে পড়েছে।

একটা ইংরেজী কাগজে অরুন্ধতী দেখলেন, সরকারী বাসে শ্রমিক দিবসের মিটিংয়ে লোক আনার খবরও বেরিয়েছে। একটা বাসের ছবিও ছাপা হয়েছে।

অরুন্ধতী আপিসে গিয়েই চীফ সেক্রেটারীর ঘরে গেলেন। চীফ সেক্রেটারী তাঁকে ঢুকতে দেখেই ইশারায় বসতে বললেন। উনি ইণ্টার-কমে আই জি-র সঙ্গে কথা বলছিলেন।

অরুন্ধতী চেয়ারে বসলেন। একটু বাদেই চীফ সেক্রেটারী রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'বরানগরে সেই বডি পাওয়ার একটা রিপোর্ট দিল্লীতে পাঠাতে হবে। হোম মিনিস্টার চাইছেন। আজই পার্লামেণ্টে কোশ্চেন আওয়াসে এ নিয়ে মেম্বাররা প্রশ্ন তুলেছেন। আই জি-র সঙ্গে কতাবার্তা বলে তুমি এখুনি রিপোর্ট তৈরি করে ফেল।'

রিপোর্ট তৈরি করে পাঠাতে কিন্তু অরুন্ধতীর বেশি সময় লাগল না। পুলিসের কাছ থেকে ইনসিডেণ্টের যে রিপোর্ট পাওয়া গেল, অরুন্ধতী দেখলেন সবই কাগজে বেরিয়েছে। অরুন্ধতী শুনেছিলেন, পুলিস কণ্ট্রোল রুমে যে সিট-রিপোর্ট তৈরি হয়, তা খবরের কাগজের কাটিং থেকেই তোলা। অনেক সময় তাই কাগজের ভুল খবরের মত পুলিসের খবরেও ভুল থাকে।

অরুন্ধতী কিন্তু কণ্ট্রোল রুম থেকে যে ইনসিডেণ্ট রিপোর্ট এসেছিল তারই একটা জিস্ট সামারি করে নিলেন।

ইনসিডেন্ট রিপোর্ট কনফার্মড্। ছ'টা বডি পাওয়া গেছে টোয়েনটিফোর পরগণার বরানগরে রাস্তার ধারে ইন দি স্মল আওয়াস অফ ক্রাইডে। বডিতে বুলেট মার্ক ছিল। হাত-পাও ফাশন্‌ড্ উইথ রোপ। সকলেব বয়স বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। দুজন অল্পবয়স্কা যুবতীও রয়েছে। কারও আইডেন্টিটি এসটাবলিশ হয়নি।

রিপোর্ট সবে তৈরি করা শেষ হয়েছে, চীফ সেক্রেটারীর বেয়ারা এসে জানাল, সাহেব তাঁকে আবার সেলাম দিয়েছেন।

অরুন্ধতী চীফ সেক্রেটারীর ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলেন ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের জয়েন্ট সেক্রেটারী বসে আছেন। চীফ সেক্রেটারী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কালকের শহীদ মিনারের রিপোর্টটা সে কাগজে দেখেছে কি না।

অরুন্ধতী বললেন—'হ্যাঁ স্যার।'

চীফ সেক্রেটারী খবরের যে অংশে স্টেটবাসে মিটিংয়ে লোক আনার কথা লেখা ছিল তাঁকে দেখিয়ে বললেন—'দেখেছ?'

অরুন্ধতী ঘাড় নাড়লেন।

চীফ সেক্রেটারী বললেন—'আমি চাই এ ব্যাপারটার একটা সিক্রেট এনকোয়ারী হোক। তুমি আর ও', ট্রান্সপোর্টের জয়েন্ট সেক্রেটারীর দিকে দেখিয়ে, 'জয়েন্টলি একটা সিক্রেট প্রোব করো। সপ্তাহ খানেকের ভিতর রিপোর্টটা চাই।'

নিজের ঘরে এসে অরুন্ধতীর দিব্যেন্দু দত্তর সেই ট্রান্সফারের ব্যাপারটা আর একবার মনে পড়ল। দিব্যেন্দু তখন আণ্ডার-সেক্রেটারী। এই মাস দুই আগেকার ঘটনা। ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের দপ্তর থেকে নেপাল থেকে আসা একদল রিলিজিয়াস্ ডেলিগেটদের কলকাতা এবং আশেপাশের জায়গা ঘুরে দেখাবার জন্য দশটা স্টেটবাসের রিকুইজিশন করা হয়েছিল। প্রথা অনুযায়ী সে ফাইল দিব্যেন্দুর কাছেও এসেছিল। আণ্ডার-সেক্রেটারী সে ফাইল সইও করেছিলেন।

কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল, রিলিজিয়াস্ ডেলিগেটদের ব্যাপারটা

নিছক তৈরি করা। ওই বাস বিশেষ একটা কাজে একটা পলিটিক্যাল পারটির কিছু লোক ব্যবহার করেছিলেন। সব ব্যাপারটা জানাজানি হলে চীফ সেক্রেটারী আণ্ডার-সেক্রেটারী হোম দিব্যেন্দু দত্তকে ট্রান্সফার করেছিলেন নিউ সেক্রেটারীয়েটে। পরিবহন দপ্তরের একজন ক্লার্কও সাসপেণ্ড হয়েছিল। কিন্তু নাটের যে গুরু, তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেননি চীফ সেক্রেটারী। কারণ কাগজপত্রে তাঁর কোন ভূমিকাই ছিল না।

দিল্লি থেকে হোম ডিপার্টমেন্টের জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং বরডার সিকিউরিটি কোর্সের আই জি সেদিন ওয়েস্ট বেঙ্গলে এলেন। পরদিন ওঁরা বরডার এরিয়ায় যাবেন। সীমান্তের ল এণ্ড অরডার সিচুয়েশন সরেজমিনে দেখবেন। ওঁরা প্রথমদিন বনগাঁ-বয়ড়া এবং নদীয়ার কয়েকটি এরিয়া ঘুরবেন। ইভাক্যুয়ি ক্যাম্পও দেখবেন। পরদিনই ত্রিপুরার বরডার দেখতে আগরতলা যাবেন।

আগেই ঠিক ছিল অরুন্ধতী ওঁদের সঙ্গে বনগাঁ ও নদীয়ায় যাবেন। অরুন্ধতীরা ভোর ছটায় বেরিয়ে পড়লেন। গাড়ি প্রথমে অরুন্ধতীকে তাঁর বাড়ি থেকে তুললো, পরে নিজাম প্যালেসের গর্ভমেণ্ট গেস্ট হাউস থেকে জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং বি এস এফ-এর আই জি-কে তুলে নিল।

গাড়ি যশোর রোডের কাছে আসতেই অরুন্ধতী দেখলেন, মোটামুটি ছোটখাট একটা কনভয় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আগে আগে আরও চারটে গাড়ি। একটা স্টেট পুলিসের, একটা বি এস এফ-এর এবং অন্য দুটোর একটি পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের, অপরটি কলকাতার একটা দৈনিক কাগজের রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার নিয়ে। ঠিক দমদমার কাছ থেকে সব গাড়িগুলি পর পর একটার পর একটা পিছু চললো।

অরুন্ধতী ভেবে দেখলেন আগেও মাত্র বার দুয়েক তিনি বরডার এরিয়ায় এসেছেন। শরণার্থী শিবির দেখেছেন। একবার এসেছিলেন রাজ্যপালের সঙ্গে। আর একবার সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডিকে নিয়ে। অরুন্ধতীর মনে আছে, সেবার কেনেডির সঙ্গে যখন সে আসে, সে কী বৃষ্টি! বর্ষাতি থাকা সত্ত্বেও একেবারে ভিজে নেয়ে উঠেছিল। সে এক বিশ্রি পরিস্থিতি। সেই ভিজে জামা কাপড়েই তাঁকে সিনেটরের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরতে হয়েছিল।

তারপর খেয়ালও হয়নি, পরে ফেরার পথে সে দেখে তার ভিজে জামা কাপড় কখন শুকিয়ে কড়কড়ে। অবশ্য রাজ্যপালের সঙ্গে যেবার প্রথম বরডারে এসেছিলেন, সে ট্রিপে তেমন কোন ঝামেলাই হয়নি। মনে হয়েছিল, জাস্ট একটা আউটিংয়ে বেড়িয়েছেন।

দু'দিন আগেই অরুন্ধতী একটা ক্রাইম সিচুয়েশন রিপোর্ট দেখছিলেন। গত বছরের তুলনায় ল এণ্ড অরডার সিচুয়েশন অনেকটা ভাল। ক্রাইম সিচুয়েশন গ্রাফের রেখাও অনেক নিচের দিকে। হিসেব করে অরুন্ধতী দেখেছিলেন, গত দু-মাসে ক্যালকাটা মিলিয়ে গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে খুন হয়েছে ষোল জন। এর মধ্যে পলিটিক্যাল মার্ডার সাতজন। অথচ গত বছর এই সময় এই পিরিয়ডে খুন হয়েছিল দেড়শরও বেশি। প্রায় সবগুলিই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড।

যদিও রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি ভাল, অরুন্ধতী শুনেছিলেন বাংলাদেশ থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র এপাশে চলে আসছে। সাধারণ লোকের হাতে এসে পড়ছে। পলিটিক্যাল পারটিগুলি সংগ্রহ করছে। অ্যান্টিসোসাল আনডারডগসরা চড়া দামে সেই সব অস্ত্রশস্ত্র কিনছে। এ সম্পর্কে একটা ইন্টালিজেনস্ রিপোর্টেও তিনি বিস্তারিত পড়েছিলেন। সেদিনও রোটাণ্ডায় আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উইক্‌লি মিটিংয়ে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ঠিক হয়েছে বরডার এরিয়ায় পুলিসী ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে। আর্মস্ স্মাগলিং বন্ধ করার জন্য আই বি-র একটা স্পেশাল ব্রাঞ্চ খোলা হবে। অরুন্ধতীর মনে পড়লো, কথা আছে একটা নতুন ডি আই জি-র পোস্টও তৈরির প্রোপাজাল রয়েছে, যার আণ্ডারে ওই স্পেশাল ব্রাঞ্চ থাকবে। সংশ্লিষ্ট ফাইল কয়েকদিন হল গভর্নরের কাছে গেছে। এখনও এপ্রুভ হয়ে আসেনি।

অরুন্ধতীদের গাড়ি বারাসতের কাছে আসতে হঠাৎ গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। ড্রাইভার বার কয়েক এক্সিলেটারে চাপ দিয়ে গাড়ির স্টার্ট দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু গাড়ি স্টার্ট নিল না। শুধু একজসট্ পাইপ দিয়ে এক রাশ ধোঁয়া বেরিয়ে এল। ড্রাইভার

লজ্জার সঙ্গে মাথা নীচু করেই অপরাধীর মত অরুন্ধতীর উদ্দেশ্যে বলল—'মেমসাহেব, পেট্রল লেতা নেহি।'

বিরক্তির সঙ্গে অরুন্ধতী গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়লেন। আই জি, বি এস এফ এবং হোমের জয়েন্ট সেক্রেটারীও আর এক পাশ থেকে নামলেন। ওঁরা বি এস এফ-এর একটা গাড়িতে উঠলেন। ঠিক হল ওঁরা এগিয়ে যাবেন। বঁনগার ইন্সপেকশন বাংলোয় চা খেতে যখন থামবেন, অরুন্ধতীর ড্রাইভার গাড়ি সারিয়ে সোজা সেখানে চলে যাবে। অরুন্ধতীদের গাড়ি চলতে শুরু করল। অরুন্ধতী চোখে আঁটা বড় সবুজ কাঁচের সান-গ্লাসটা একবার খুলে আবার পরলেন।

ওঁরা যেতে যেতে টুকিটাকি দু-চারটা কথা বলতে লাগলেন। জয়েনট-সেক্রেটারী অরুন্ধতীকে জিজ্ঞেস করলেন—'মিস সেন, এখানে ওপেন মার্কেটে রাইস কত?'

অরুন্ধতী বললেন—'দু-টাকা আড়াই টাকার মধ্যে ভ্যারি করে।'

অরুন্ধতীরা দেখলেন, রাস্তার দু'ধার দিয়ে শরণার্থীরা লাইন করে উলটো দিকে চলেছে। সকলের হাতেই খালি থালা বাসন। জয়েন্ট সেক্রেটারী অরুন্ধতীকে জিজ্ঞেস করলেন—'হোয়ার দে আর গোয়িং, মিস সেন?'

অরুন্ধতী বললেন—'দে আর গোয়িং টু এ নিয়ারেস্ট ক্যাম্প টু ড্র দেয়ার রেশন, স্যার।'

বি এস এফ-এর আই জি জানতে চাইলেন—'ইভাক্যুয়িরা এখন পার হেড কত রেশন পাচ্ছে?

অরুন্ধতী বললেন—'চাল ডাল আলু পেঁয়াজ ইত্যাদি মিলিয়ে ওভার টু কিলোগ্রাম। এ ছাড়া অন্যান্য আনাজপাতি এবং ফুয়েলও ফ্রি দেওয়া হচ্ছে।'

অরুন্ধতীদের গাড়ি হাবরার কাছে আসতেই গাড়ির গতি কমে এলো। স্টেশন রোডের দিকে, যশোর রোডের উপর রাস্তার ধারে

চাষী আর ব্যাপারীরা সব চাল, ডাল, কপি, বেগুন, আলু, শাক-সবজি, ফলফলাদি নিয়ে হাটে বসেছে। সবই কাঁচা বাজার। কয়েকজনের কাছে আবাব হাঁস, ডিম, মুরগিও রয়েছে। কেনা-বেচা চলছে।

জে এস হোম অরুন্ধতীকে জিজ্ঞেস করলেন—'হোয়াট প্লেস ইজ দিস, মিস সেন?'

অরুন্ধতী বললেন—'হাবরা স্যার।'

জে এস জিজ্ঞেস করলেন—'এখানে কোন্ পলিটিক্যাল পারটির ডমিনেশন বেশি, মিস সেন? নকশালাইটরা ইনফিলট্রেট করতে পেরেছে?'

গাড়ি খুব স্লো স্পিডে যাচ্ছিল ভিড়ের মধ্যে দিয়ে। জানলা দিয়ে ওঁরা হাট দেখছিলেন। এক জায়গায় আসতেই কী দেখতে পেয়ে জে এস হোম হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—'মিস সেন, প্লিস স্টপ দ্য কার।'

গাড়ি একটু এগিয়েই রাস্তার উপর থেমে গেল। জে এস হোম গাড়ির ডালা খুলে নেমে পড়লেন। অরুন্ধতীরাও নামলেন। জে এস হোম একটা চাষীর কাছে গিয়ে দড়িতে বাঁধা ছোট ছোট কয়েকটা মুরগি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কিতনা দাম?'

ওঁরা যখন মুরগি দর করছিলেন, কোথা থেকে পোষাক পরা এক পুলিস অফিসার তাদের সামনে সেল্যুট করে দাঁড়াল—'আই অ্যাম ও সি, হাবরা পি এস, স্যার।' তারপরই জে এস হোমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'আপনার ক'টা মুরগি চাই স্যার?'

অরুন্ধতী একটু পাশে সরে গিয়ে একটা চাষার ছোট ছেলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। একবার তাকিয়ে দেখলেন, জে এস হোম হাবরা থানার ও সি-কে পাঁচটা টাকা দিতে গেলেন। কিন্তু ও সি ফিরিয়ে দিল। চাষাটা দু-হাতে চারটে মুরগি নিয়ে পেছনে জে এস-এর নিজস্ব গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অরুন্ধতী ওদিকে আর

তাকালেন না।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। ধীরে ধীরে গাড়ির ড্রাইভার স্পিডও বাড়িয়ে দিল। মিনিট দেড়েকের মধ্যে অরুন্ধতীদের গাড়ি বনগাঁ ইন্সপেকশন বাংলোয় এসে ঢুকল।

ওখানে বনগাঁর এ ডি এম, এস ডি ও, রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশনের কিছু অফিসার এবং আরও কয়েকজন ওঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একটু বাদেই বি এস এফ-এর এরিয়া কমানডাণ্ট এবং আরও দু-চারজন অফিসার এসে উপস্থিত হলেন। অরুন্ধতীরা ইন্সপেকশন বাংলোয় ব্রেকফাষ্ট সেরে নিলেন। আসবার সময় কলকাতার ফ্লুরি থেকে ওঁরা ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ প্যাকেট নিয়ে এসেছিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁরা আবার গাড়িতে চেপে বসলেন। অরুন্ধতীর ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ইতিমধ্যে এসে পড়েছিল। সে গাড়িও ওদের পেছনে পেছনে চলল। গাড়ি বাঁ দিক দিয়ে সোজা বাগদা থানার দিকে ছুটল।

আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই ওঁরা বাগদা থানায় এসে উপস্থিত হলেন। ঠিক হল ওরা সব বাগদা থানাতেই গাড়ি রেখে বি এস এফ-এর জিপে বয়ড়ার বরডারে যাবেন। একেবারে কপোতাক্ষ নদীর তীর পর্যন্ত। অরুন্ধতী এবং বি এস এফ-এর আই জি একটা জিপে উঠলেন। আর একটা জিপে জে এস হোম, লোকাল বি এস এফ কমানডাণ্ট এবং আরও একজন। পর পর আরও গোটা কয়েক জীপ ওদের পিছনে পিছনে গেল। ওতে এ ডি এম, এস ডি পি ও এবং অন্যান্য লোকাল অফিসাররা।

বরডারে এসে ওঁরা সকলে কপোতাক্ষ নদীর পাড়ে দাঁড়ালেন। লোকাল বি এস এফ কমানডাণ্ট একটা ম্যাপ খুলে ওদের দেখাল। ওঁদের ওখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল বরডার লাইন কতটা দূরে। ওপাশে পাকিস্তানী সৈন্য কোথায় কোথায় ক্যাম্প করেছে। অরুন্ধতী একটা বাইনাকুলার চোখের উপর ধরে ওপারে দূরে দেখতে লাগলেন।

বি এস এফ-এর লোকাল কমানডান্ট দূরে হাত দেখিয়ে ওঁদের দেখালো পাক সৈন্য কতটা এগিয়ে এসেছিল।

বয়ড়ার একটা গাঁয়ে ওঁরা গেলেন। দেখলেন, কতকগুলি ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। ঘরের মাটির দাওয়ায় চাপ চাপ কালো রক্ত। কয়েকদিন আগে পাকিস্তানী সৈন্যরা এসে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। নিরীহ গ্রামবাসীর উপর মেসিনগান চালিয়েছে। তার চিহ্ন এখনও মুছে যায়নি।

আই জি বয়ড়ার কোথায় কতজন বি এস এফ ফোর্স মবিলাইজ্ড হয়েছে, জানতে চাইলেন। দু-চারটা প্রয়োজনীয় টুকিটাকি নির্দেশও দিলেন। অফিসারদের বললেন, শুনছি আর্মস খুব স্মাগলড্ হয়ে এ দিকে আসছে। ঠিক মত ভিজিলেন্সের ব্যবস্থা নেবেন। দরকার হলে বাড়তি ফোর্স মবিলাইজ্ করবেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁরা আবার বাগদা থানায় ফিরে এলেন। সেখান থেকে সোজা পেট্রোপোল বয়ড়ারে।

প্রোগ্রাম মত ওঁরা ফেরার পথে বনগাঁয় একটা ইভাক্যুয়ি ক্যাম্প দেখতে গেলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের এক স্বামীজি তাঁদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে ক্যাম্প দেখালেন। অরুন্ধতীরা জানতে চাইলেন, রিলিফ মেটিরিয়াল ঠিক মত আসছে কিনা। হেলথ সানিটেশনের কোনও প্রবলেম রয়েছে কিনা। ঔষধপত্র, ব্লিচিং পাউডার, ত্রিপল ইত্যাদি কোন জিনিষের কতটা অভাব। কোনটা কতটা লাগবে জানতে চাইলেন। প্রয়োজনমত টুকিটাকি নোটও করে নিলেন।

অরুন্ধতীরা দু-চারজনকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তারা দেশে ফিরে যেতে চায় কিনা। সকলেরই সেই একটিই উত্তর— বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তবেই ফিরবে।

কলকাতার কাছে এসে ওঁরা সল্ট লেকের ক্যাম্পও দেখতে গেলেন। ওই ক্যাম্প সম্পর্কে নানা অভিযোগ অরুন্ধতী শুনেছিলেন। কিছু কিছু পলিটিক্যাল পারটির লোকজন নাকি ইভাক্যুয়িদের মধ্যে প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছে। অযথা গভর্মেণ্টের

এগেনসটে ওদেরকে ফ্যান করছে।

একটা ক্যাম্পের সামনে এসে অরুন্ধতী দেখলেন, লাল ফ্ল্যাগ, ফেসটুন, প্লাকার্ড হাতে কিছু লোকজন আর পাঁচজনকে কী সব বোঝাতে চেষ্টা করছে। অরুন্ধতীদের দেখতে পেয়েই ওদের জটলা ভেঙে গেল। যে যার এদিক-ওদিক সরে পড়ল। অরুন্ধতী এরিয়ার ডি সি-কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—'এরা সব কারা ?'

ডি সি বললেন—'সব ক্যাম্পেরই লোক। লোকাল লোকও দু-চারজন থাকতে পারে।'

অরুন্ধতী জিজ্ঞেস করলেন—'ওরা কী চায় ? কোন্ পার্টির ?'

ডি সি বললেন—'দাঁড়ান মাডাম, লোকাল থানার ও সি-কে জিজ্ঞেস করে আসি।'

অরুন্ধতী বিরক্তির সঙ্গে বললেন—'হোপলেস্ !'

সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে অরুন্ধতীর দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হল। কথা ছিল, লালতা সিং অরুন্ধতীদের বাড়িতে গাড়ি গ্যারাজ করে সোজা কসবায় তার বাড়ি চলে যাবে। পরদিন ভোরবেলা আবার এসে অরুন্ধতীকে আপিসে নিয়ে যাবে।

অরুন্ধতী সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছিলেন, লালতা সিং তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল—'মেমসাব !' লালতা সিংয়ের দু'হাতে দড়ি বাঁধা চারটে মুরগি। ডান হাতের আঙুলে গাড়ির চাবির রিং।

লালতা সিং বলল—'মেমসাব, গাড়িকা পিছু মে এ চিজ থা। আপকী লিয়ে।'

অরুন্ধতী হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠল না। কপট ভৎর্সনা করে উঠলেন—লালতা সিং, ইয়ে চিজ্ কোন দিয়া ? আউর তোম্ লিয়া কিঁউ ?'

লালতা সিং বলল—'হাবরা থানাকা ও সি দিয়া মেমসাব। হামকো কিয়া কসুর মেমসাব ? ও দিল্লিকা সাবকো দিয়া, আপকী

ভি দিয়া।'

ঘৃণায় রাগে অরুন্ধতী আর কথা বলতে পারলেন না। বারান্দার লাইটের অস্পষ্ট আলোতেও দেখতে পেলেন দুটো মুরগি তখনও চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে।

'চিড়িয়াকো তোম ছোড় দেও কি তোমরা ঘর লে যাও লালতা সিং। জো তোমার মরজি।' —অরুন্ধতী আর দাঁড়ালেন না। ত্রস্ত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন।

পরদিন আপিসে এসেই অরুন্ধতী চব্বিশ পরগণার এস পি-কে টেলিফোনে চাইলেন। কিন্তু এস পি-কে পাওয়া গেল না। নামখানায় গেছেন। অরুন্ধতী পি এ-কে রেঞ্জের ডি আই জি-কে লাইন দিতে বললেন। কিন্তু অল্প সময় বাদেই কী ভেবে আবার পি এ-কে বললেন—'না থাক। ডি আই জি-কে লাইন দিতে হবে না।'

অরুন্ধতীর নিজেরই কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। এ ব্যাপারে কাকে কী বলবেন। বলে কীই বা হবে? বড় জোর ও সি ট্রানস্ফার হবে। হাবরার ও সি হবে ক্যানিং অথবা কাকদ্বীপের ও সি। তাতে কোন্ সুরাহাটা হবে? এ জিনিষ বন্ধ হবে? যুগের পর যুগ ধরে যে প্রথা, যে জিনিষ চলে আসছে তা এত সহজেই বদলে যাবে!

পুশ বাটন টিপে অরুন্ধতী পি এ-কে ডাকলেন। সি পি-র নামে একটা ডিকটেশন দিলেন। টি ভি-র মাধ্যমে ক্যালকাটার ট্র্যাফিক কণ্ট্রোলিংয়ের যে প্রোপোজাল লালবাজার থেকে এসেছিল তা রেফারড্ ব্যাক করলেন।

এনগেজমেণ্ট রোসটারের দিকে তাকিয়ে অরুন্ধতী দেখলেন, ছটোয় সি এস-এর ঘরে পি এম-এর আসন্ন সফরের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেণ্টের মিটিং রয়েছে। আই জি, সি পি এবং কলকাতা ও স্টেট পুলিশের ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসাররাও থাকবেন। পি এম পাবলিক মিটিং করবেন ব্রিগেডে। যদিও কংগ্রেস সেই মিটিং অরগানাইজ করছে, গভর্মেণ্টকে পি এম-এর সব সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হবে। অরুন্ধতী জানেন পি এম-এর সিকিউরিটি ব্যবস্থার মোটামুটি এক ছক তাদের কাছে রয়েছেই। সেটা শুধু মিলিয়ে ঠিক করে নেওয়া।

টেবল থেকে জলের গ্লাসটা টেনে নিয়ে অরুন্ধতী একটু জল খেলেন। বেয়ারাকে ডেকে এক কাপ চা দিয়ে যেতে বললেন। তারপর টেবলের ডাইরেক্ট টেলিফোনটা বেজে উঠতেই অরুন্ধতী রিসিভার তুলে নিলেন—'হ্যালো।'

গলা শুনেই অরুন্ধতী বুঝলেন ওপাশে দিব্যেন্দু।

দিব্যেন্দু জিজ্ঞেস করলেন—'ক'টায় বেরনো হচ্ছে?'

অরুন্ধতী বললেন—'দেখি।'

অরুন্ধতী জানেন, এ দিব্যেন্দুর এক অদ্ভুত খেয়াল। কখনও অরুন্ধতী, কখনও তুমি। কখনও আবার সম্বোধন শুধুই ভাববাচ্যে—এই, হচ্ছে, হবে। আর তখনই অরুন্ধতী দিব্যেন্দুকে এড়িয়ে যেতে চান। তাঁর কথার স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব দেন না। অরুন্ধতী আবার ভাবেন, এ তাঁর কোন খেয়াল নয়। ইচ্ছে করেই দিব্যেন্দু এভাবে কথা বলে। তাঁকে সোজাসুজি তুমি বলতে ওর সংকোচ।

অরুন্ধতী রিসিভার কানে লাগিয়েই ছিলেন। দিব্যেন্দু বললেন—'দেখি মানে! ক'টায় বেরচ্ছ ঠিক করে বলো। এক সঙ্গে বেরবো। সন্ধ্যায় গ্রাণ্ডে সেই জাপানিদের ককটেল আছে খেয়াল আছে?'

'খুউব'—অরুন্ধতী টেনে টেনে বললেন। 'কিন্তু আমার যাওয়া হচ্ছে না। হাতে অনেক কাজ। তা ছাড়া বাপীর শরীরটাও ভাল নেই।'

দিব্যেন্দু বললেন—'তা হলে আমার আর যাওয়া হলো না।'

অরুন্ধতী বললেন—'কেন, তুমি যাও না।'

দিব্যেন্দু বললেন—'না থাক।' বলেই ফোনটা রেখে দিলেন।

রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে অরুন্ধতী একটু হাসলেন।

এই সময় সুইং ডোর ঠেলে অরুন্ধতীর পি-এ ঘরে ঢুকলেন। ওঁর হাতে ছোট্ট একটা শ্লিপ।

পি-এ অরুন্ধতীর সামনে শ্লিপটা এগিয়ে দিতে দিতেই বললেন—'এই ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমাদের এক ডিসমিসড্ পুলিস সাব-ইনসপেক্টরের ওয়াইফ।'

অরুন্ধতী জিজ্ঞেস করলেন—'আমার কাছে?' তারপরেই কি ভেবে বললেন—'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিন।'

একটু বাদেই একটি বিবাহিতা মেয়ে ছোট একটা ছেলের হাত ধরে ভিতরে এসে ঢুকল। মেয়েটির পরনে সাধারণ আটপৌরে ছাপা শাড়ি। দু'হাতে দু'গাছা সরু সোনার রুলি, শাঁখা। সিঁথিতে সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে।

মেয়েটিকে দেখেই অরুন্ধতীর কি রকম মায়া হল। তাকে চেয়ারে বসতে বললেন। তারপর জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকালেন।

মেয়েটি কথা বলতে গিয়েও প্রথমে বলতে পারল না। ওর দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কান্না চেপে শেষে অনেক কষ্টে সে যা বলল তা হল, ওর স্বামী বেলঘরিয়া থানার সেকেণ্ড অফিসার। ছয় বছরের উপর চাকরী করেছে। বছর চারেক হল ওদের বিয়ে হয়েছে। পাশেই ছোট ছেলেটাকে দেখিয়ে বলল, এই তাদের ছেলে। কিছুদিন আগে গভর্মেন্ট তার স্বামীকে তিনশ এগারো ধারায় ছাঁটাই করেছে। এখন এই ছেলে নিয়ে সে কোথায় দাঁড়াবে, কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। তাই অরুন্ধতীর কাছে এসেছে যদি তার স্বামী আবার চাকরী ফিরে পায়।

অরুন্ধতী মেয়েটিকে তার স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করলেন। মেয়েটি কিন্তু প্রথমে স্বামীর নাম বলতে চাইছিল না। লজ্জা পাচ্ছিল। শেষে অবশ্য আস্তে আস্তে তার স্বামীর নাম উচ্চারণ করল।

মেয়েটির সামনেই অরুন্ধতী ইনটার-কমে আই জি-র সঙ্গে মেয়েটির স্বামীর নাম ধরে ইংরেজীতে কী সব কথা বললেন। মেয়েটি বুঝতে পারল না। শেষে টেলিফোন নামিয়ে রেখে মেয়েটিকে বললেন—'আপনার স্বামী সি পি এম করত, পারটির হয়ে স্পাইং করত, রাজ্যপাল তাই তাকে বরখাস্ত করেছেন। এ ব্যাপারে সে কী করবে?'

মেয়েটি তখন অরুন্ধতীর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে তার

পা দুটো জড়িয়ে ধরল—'আমায় দিদি বাঁচান। না খেতে পেয়ে এই ছেলে নিয়ে মরে যাব। আমি ওঁর হয়ে ক্ষমা চাইছি। ওঁর অপরাধের জন্য ওঁকে শাস্তি দিন দিদি,' তারপর ছেলেকে দেখিয়ে বলল, 'একে মারবেন না দিদি।'

শেষ পর্যন্ত মেয়েটি মাটিতেই তার মাথা ঠুঁকতে লাগল। মাকে ওই অবস্থায় দেখে ছেলেটিও ভয়ে কেঁদে উঠল। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। এমন পরিস্থিতিতে অরুন্ধতীকে আগে আর কখনও পড়তে হয়নি।

অরুন্ধতী মেয়েটিকে এক রকম জোর করেই টেনে তুললেন। তারপর বললেন—'আপনি আপনার স্বামীকে বলবেন, ক্ষমা চেয়ে রাজ্যপালের কাছে যেন চিঠি লেখে। তারপর সেই চিঠি আমাকে দিয়ে যাবেন। দেখি কী করতে পারি।'

মেয়েটি বেরিয়ে যেতেই অরুন্ধতী ভাবলেন, এই তো পরিণাম। মেয়েটির স্বামীর উপর তাঁর রাগ হল। মনে মনে বললেন, এই তো তোদের মুরোদ। নিজেরা বিপ্লব করিস, আর চাকরী গেলে খোয়া চাকরী ফিরে পাবার জন্য আবার স্ত্রীকে লোকের কাছে পাঠিয়ে দিস।

অরুন্ধতী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, চীফ সেক্রেটারীর ঘরে মিটিংয়ের প্রায় সময় হয়ে এসেছে। দুটোয় মিটিং। তখন একটা বেজে কুড়ি-টুড়ি।

মেয়েটি আসার পর থেকে অরুন্ধতীর মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। লাঞ্চ করতে বসেও লাঞ্চ খেতে পারলেন না। বার বারই মেয়েটির মুখটা ভাসতে লাগল। এই ভেবে তাঁর আরও খারাপ লাগল, মেয়েটিকে শুধু মিথ্যেই সান্ত্বনা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর কী বা করণীয় আছে?

বাড়ি ফিরে অরুন্ধতী কী মনে করে দিব্যেন্দুকে টেলিফোন

করলেন। ফোনটা দিব্যেন্দুই ধরলেন।

অরুন্ধতী জিজ্ঞেস করলেন—'গ্রাণ্ডে পারটিতে তুমি যাচ্ছ তো দিব্যেন্দু? যাবার পথে আমাকে তুলে নিয়ে যেয়ো।'

দিব্যেন্দু কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অরুন্ধতী তার আগেই খটাস করে ফোনটা রেখে দিলেন।

ছ'টা নাগাদ দিব্যেন্দু অরুন্ধতীকে তুলতে এসে দেখেন, অরুন্ধতী তখনও তৈরি হয়নি। একটা সোফায় হেলান দিয়ে ইভস্ উইক্লি পড়ছে। ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে দিব্যেন্দু অবাক—'কী ব্যাপার, যাবে না?'

আলস্যের ভঙ্গিতে অরুন্ধতী টেবল-এর উপর ম্যাগাজিনটা রেখে উঠে দাঁড়ালেন—'ওখানে গিয়ে কাজ নেই দিব্যেন্দু। তার চেয়ে বরং চল গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি।'

দিব্যেন্দু তাতেই রাজী। অরুন্ধতী দিব্যেন্দুকে বসতে বলে জামা কাপড় বদলাতে উপরে গেলেন। মিনিট দশেকের মধ্যেই আবার নিচে নেমে এলেন।

অরুন্ধতীরা গঙ্গার দিকে যাবে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু গ্রাণ্ডের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কী ভেবে অরুন্ধতীই দিব্যেন্দুকে গাড়ি থামাতে বললেন। তারপর দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন—'চল দিব্যেন্দু, এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়েই যাই।'

দিব্যেন্দু কিছু বলার আগেই অরুন্ধতী গাড়ি থেকে নেমে ফুটপাতের দিকে হাঁটা শুরু করে দিলেন। দিব্যেন্দুও গাড়ি লক করে তাঁর পিছু পিছু এগোলেন।

ওঁরা যখন গ্রাণ্ডের দোতলায় বাঙ্কোয়েট হলে এসে ঢুকলেন, দেখলেন ককটেল শুরু হয়ে গিয়েছে। ওঁদের দেখতে পেয়ে জাপানি কনস্যুলেটের ইবেদা এগিয়ে এলেন।

হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন। তারপর জাপানি ট্রেড

ডেলিগেশনের লিডার ওসাকোকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

ওসাকোকার সঙ্গে আগেই এয়ারপোর্টে ওঁদের দুজনেরই আলাপ হয়েছে। ওসাকোকা ওঁদের দেখেই চিনলেন। তারপর বেয়ারাকে ইশারায় ডেকে ওঁদের সামনে ড্রিংকসের ট্রে এগিয়ে আনতে বললেন।

অরুন্ধতী অ্যাপেল জুসের একটা গ্লাস তুলে নিলেন। আর দিব্যেন্দু ছোট একটা হুইস্কি।

অরুন্ধতী বাঙ্কোয়েট হলের এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। অনেক পরিচিত মুখ চোখে পড়ল। ইনডাষ্ট্রিসের ডাইরেক্টর, বেঙ্গল চেম্বারের চেয়ারম্যান, দুজন নামী শিল্পপতি, কণ্ট্রোলার অব স্টিল—এঁদেরকে অরুন্ধতী দেখেই চিনতে পারলেন। বাকি অনেকের মুখ পরিচিত মনে হলেও ঠিক চিনতে পারলেন না। একপাশে অরুন্ধতী দেখলেন স্টেট ট্রান্সপোর্টের চেয়ারম্যান, সিভিল ডিফেন্সের অরুণ দত্ত এবং স্টেট ট্রান্সপোর্টের কংস চাকলাদার। অনেকেই সস্ত্রীক এসেছেন।

অরুন্ধতীরা কিন্তু বেশি সময় থাকলেন না। কিছু সময় পরেই দুজনে বেরিয়ে এলেন। অরুন্ধতী নিজেই ড্রাইভারের সীটে বসে গাড়ি সোজা আউটরাম ঘাটের দিকে চালিয়ে নিয়ে গেলেন।

আসাম ও মেঘালয়ে শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে যাবার পথে প্রাইম মিনিস্টার সেদিন দমদমে নামলেন। এয়ারফোর্সের স্পেশাল প্লেন রাজহংস ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে কাঁটায় কাঁটায় দশটায় ইণ্টারন্যাশনাল রানওয়ের টারম্যাকে এসে দাঁড়াল। গোটা এয়ারক্র্যাফ্‌টাই ধবধবে সাদা। ঠিক যেন ডানামেলা সাদা একটা রাজহাঁস। কিছুক্ষণের মধ্যে প্লেনের গায়ে সিঁড়ি লাগানো হল। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন প্লেনের ক্যাপটেন। দেখলেন, সিঁড়ি ঠিক লাগানো হয়েছে কিনা। সব দেখেশুনে ক্যাপটেন আবার ভেতরে ঢুকে গেলেন।

মুখে এক ঝলক হাসি আর সকালের মিষ্টি রোদ মাথায় করে একটু বাদেই ইন্দিরা বাইরে এসে সিঁড়ির উপর দাঁড়ালেন। প্রতীক্ষারত জনতার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানালেন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নীচে নেমে এলেন।

বেশ কিছুদিন পর আবার ইন্দিরাকে এত সামনাসামনি দেখছেন অরুন্ধতী। এই সেদিন ইন্দিরা ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ঘুরে রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বুঝিয়ে এসেছেন। তাঁর সেই সফরের উদ্দেশ্য কতখানি সফল হয়েছে তা অরুন্ধতী জানেন না। বোধ হয় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও জানেন না। অরুন্ধতী দেখলেন, এই প্রথম তার চোখে পড়ল, পঞ্চাশোর্ধ্ব নেহরু-তনয়ার সত্যিই বয়স হয়েছে। চেহারায়, সারা অবয়বে সেই বয়সের ছাপ। চোখে মুখে কী রকম যেন ক্লান্তির চিহ্ন। এ যেন সেই আগের ইন্দিরা নয়। অরুন্ধতী আর এক ইন্দিরা গান্ধীকে চোখের সামনে দেখছেন। প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে সেদিন যাঁরা বিমানবন্দরে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের অফিসাররা এবং কংগ্রেসের ডজন দুয়েক হোমরা-চোমরা নেতা।

আর বিমানবন্দরের নিষিদ্ধ এলাকার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল ইন্দিরা-অনুরাগী হাজার হাজার ছোট বড় মেয়ে ও পুরুষ।

অরুন্ধতী ভেবে দেখলেন, সাম্প্রতিক বিদেশ সফর শেষে দেশে ফেরার পর ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী এলেন। প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় তাঁর একদিনের অবস্থানকালে দফায় দফায় সেণ্টার ও স্টেটের অফিসারদের সঙ্গে জরুরী বৈঠকে বসবেন। সেই মিটিংয়ে শরণার্থী সমস্যা, বরডারের পরিস্থিতি, ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডেভলাপমেণ্ট প্ল্যান প্রোগ্রাম, ল এণ্ড অরডার সিচ্যুয়েশন এবং অন্যান্য নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হবে। দিল্লী থেকে আগেই ক্যাবিনেট সেকরেটারী, হোম সেকরেটারী, প্রাইম মিনিস্টারের সেকরেটারীয়েটের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অফিসাররা এসেছেন। তাঁরা সেই বৈঠকে যোগ দেবেন।

পি এম-এর ট্যুর প্রোগ্রাম অরুন্ধতীই করেছিলেন। বিভিন্ন অফি-সিয়াল মিটিংস ছাড়াও প্রাইম মিনিস্টার বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে একটা পাবলিক মিটিংএ ভাষণ দেবেন। অবশ্য ট্যুর প্রোগ্রামে নেই, ফোর্ট উইলিয়ামে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তিনি চীফ অব দ্য আরমি স্টাফ জেনারেল মানেকশ এবং জি ও সি ইন-সি ইস্টার্ন কমানড্ লেফটানাণ্ট জেনারেল অরোরা ও অন্যান্য আরমি অফি-সারদের সঙ্গে মিটিং করবেন। সেই মিটিংয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামও থাকবেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী দু'দিন আগেই পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। কয়েকটা বরডার এরিয়া এবং রিফিউজি ক্যাম্প তিনি এরই মধ্যে দেখে এসেছেন।

প্রাইম মিনিস্টারের কনভয় দমদম থেকে বেরিয়ে সোজা ভি আই পি রোড ধরে এগিয়ে চলল। রাস্তার দু' পাশে অগণিত জনতা। কোথাও কোথাও 'ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠল। কেউ কেউ ফুলও ছুঁড়ল। বনেটখোলা কালো রঙের বড় গাড়িতে দাঁড়িয়ে রাস্তার উপর অপেক্ষমান জনতাকে তিনি হাত জোড় করে

অভিবাদন জানাতে লাগলেন।

সল্ট লেকের কাছে পি এম-এর কনভয় এগিয়ে আসতেই ইন্দিরা গান্ধীর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। দূর থেকে সল্ট লেকের শরণার্থী শিবিরগুলি দেখতে পেয়ে তাঁর সেই হাসিখুশী-মাখা মুখের উপর যেন একটা কালো ছায়া নেমে এলো।

মানিকতলায় পি এম-এর কনভয় আসতে অরুন্ধতী তাঁর গাড়ি থেকে দেখতে পেলেন রাস্তার দু'পাশে বিশাল জনতা। এখানে-সেখানে কিছু কিছু সি আর পি এবং সাদা পোষাকের ক্যালকাটা পুলিস। ঠিক চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর মুখটায় রাস্তার দু'পাশে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। সকলের হাতেই স্কুলের বই, খাতা। কারও মর্নিং স্কুল ছুটি হয়েছে। কেউ আবার স্কুলে যাবার পথে ইন্দিরা গান্ধীকে দেখবার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ওদের খুশী খুশী হাসিমাখা মুখ দেখেও যেন ইন্দিরা হাসতে পারলেন না।

রাজভবনের ভিতর পি এম-এর কনভয় প্রবেশ করলে অরুন্ধতী গেট থেকেই ড্রাইভারকে রাইটারসের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বললেন। রাইটারসে নিজের চেম্বারে এসে অরুন্ধতী দেখলেন, কলকাতার বাংলাদেশ মিশনের কয়েকজন প্রতিনিধি বসে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে অরুন্ধতী বুঝলেন, ওঁরা পি এম-কে মিট করতে চান। অরুন্ধতী ওঁদেরকে চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন।

বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা চলে যেতেই অরুন্ধতী সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকলেন। চোখে মুখে বার কয়েক জলের ঝাপটা দিলেন। টাওয়েলে হাত মুখ মুছে নিলেন। তারপর চেয়ারে বসতে না বসতেই তাঁর টেবল-এ রাখা টেলিফোন ঝনঝন করে বেজে উঠল। অরুন্ধতী রিসিভার তুলে নিলেন—'হ্যালো।'

ওপাশে চীফ সেক্রেটারী—'তুমি একবার আমার ঘরে এসো অরুন্ধতী।'

'যাচ্ছি স্যার'—রিসিভার নামিয়ে রেখে অরুন্ধতী চেয়ার ছেড়ে

উঠে দাঁড়ালেন।

চীফ সেক্রেটারীর ঘরে এসে অরুন্ধতী দেখলেন, বাংলাদেশ মিশনের সেই লোকজন। চীফ সেক্রেটারী অরুন্ধতীকে বললেন পি এম-এর সেক্রেটারী মদনগোপালের সঙ্গে যোগাযোগ করে এঁদেরকে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েনটমেণ্ট করিয়ে দিতে। পাবলিক মিটিংয়ের পর পি এম কিছু সময় ফ্রি থাকবেন। তখনই যেন ইণ্টারভিয়্যুর ব্যবস্থা করা হয়।

নিজের ঘরে এসে অরুন্ধতী রাজভবনে লাইন চেয়ে পি এম-এর সেক্রেটারীকে চাইলেন। পি এম-এর সেক্রেটারীকে অনেক চেষ্টার পর টেলিফোনে পাওয়া গেল। সব কিছু শোনার পর মদনগোপাল অরুন্ধতীকে বাংলাদেশের লোকজনকে তাঁর কাছে রাজভবনে পাঠিয়ে দিতে বললেন। তিনি চেষ্টা করে দেখছেন পি এম-এর সঙ্গে ওঁদেরকে ইণ্টরভিয়্যু করিয়ে দেওয়া যায় কিনা।

অরুন্ধতী মহাকরণের সেণ্ট্রাল স্টেয়ারকেসের কাছে ডিউটিরত এক পুলিস অফিসারকে ডেকে ওঁদেরকে রাজভবনে নিয়ে যেতে বললেন। তারপর ওঁরা চলে যেতেই বনমালীকে ডেকে খাবার দিতে বললেন।

বিকেলের দিকে নিজের ঘরে বসে অরুন্ধতী ট্রানজিসটারে প্রাইম মিনিস্টারের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের মিটিংয়ের বক্তৃতা শুনছিলেন। আর ফাঁকে ফাঁকে টেবল-এ রাখা ফাইল একটা দুটো টেনে টেনে খুলে দেখছিলেন। তাঁর সামনে চেয়ারে বসেছিলেন হোম জেনারেলের স্পেশাল অফিসার এবং লেবার সেক্রেটারী। ওঁরাও ট্রানজিসটার শুনছিলেন।

মিনিট কয়েক হল সবে পি এম তাঁর বক্তৃতা শুরু করেছেন। অরুন্ধতীরা আপিস ছুটির পর রিলাক্সড মুডে খুব ঔৎসুক্যের সঙ্গে পি এম-এর স্পিচ শুনছিলেন। ওঁরা ভেবেছিলেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে

এই সভায় পি এম কিছু পজিটিভ স্টেটমেণ্ট করবেন।

ইনফরমেশনের ডাইরেক্টর এই সময় এক রকম ছুটতে ছুটতেই অরুন্ধতীর ঘরে এসে ঢুকলেন। ওঁর হাতে টেলিপ্রিণ্টারে আসা পি টি আই'র একটা মেসেজ। ইনফরমেশনের ডাইরেক্টর মেসেজটা অরুন্ধতীর সামনে এগিয়ে দিলেন। মেসেজের দিকে চোখ বুলোতেই অরুন্ধতীর গলা থেকে ভয় ঘৃণা এবং বিদ্বেষ-মাখা অদ্ভুত একটা স্বর বেরিয়ে এলো। চেয়ারে বসা হোম জি এ-র এস ও এবং লেবার সেক্রেটারী দুজনেই অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালেন। নিজেকে সামলে নিয়েই অরুন্ধতী ডি আই-কে জিজ্ঞেস করলেন—'পি এম-কে এ মেসেজ পাঠিয়েছেন?'

ইনফরমেশনের ডাইরেক্টর বললেন—'ইয়েস মাডাম। চীফ সেক্রেটারী সে মেসেজের কপি নিয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউনডে ছুটে গেছেন। পি এম-কে খবরটা জানাবেন।'

টেলিপ্রিণ্টার মেসেজটার দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে অরুন্ধতী দেওয়ালে টানানো ক্যালেনডারে তারিখটা একবার মিলিয়ে নিলেন। তেসরা ডিসেম্বর উনিশ শ' একাত্তর সাল। ভাবলেন, উত্তরকালে যখন বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা হবে তখন আর পাঁচটা তারিখের সঙ্গে এ তারিখটাও লেখা থাকবে। এই তারিখেই ভারতের পশ্চিমখণ্ডে বিঘোষিত বর্বর পাক আক্রমণ শুরু হয়েছিল।

অরুন্ধতীর মনে আছে, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউনডের সেই মিটিং শেষে প্রধানমন্ত্রী সোজা রাজভবন ফিরে এসেছিলেন। পরের সব প্রোগ্রাম, এনগেজমেনট বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। দিল্লীর অফিসারদের সঙ্গে কিছু সময় ক্লোজড্ ডোর মিটিং-এর পর সেদিন রাত্রেই পি এম দিল্লী ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর দিল্লী থেকে তাঁর সেই ঐতিহাসিক মিড-নাইট ব্রডকাস্ট। গোটা দেশেই জরুরী অবস্থা ঘোষিত হল। বলা হল, বর্বর পাক আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দিতে ভারত বদ্ধপরিকর। সৈন্যবাহিনীকে সেই রকমই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরদিন থেকে অরুন্ধতী দেখলেন রাইটার্স বিলডিংসের গতানুগতিক জীবনের বাইরের আর একটা জীবন। শুধু তাঁরই নয়, শুধু মহাকরণ কিংবা কলকাতার জীবনই নয়, গোটা দেশে ভারতবর্ষের পঞ্চান্ন কোটি লোকের কাছে, সে এক চরম পরীক্ষা। একটানা চোদ্দটা দিন, পাক-ভারত যুদ্ধের ওই ক'টা দিন, কী যে উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটল অরুন্ধতীর! শুধু আপিস আর বাড়ি। বাড়ি আর আপিস। আর রেডিওতে কান রেখে সকাল দুপুর রাত্রি যুদ্ধের খবর শোনা। কারফিউ, সাইরেন, এয়াররেড সিগনাল, সিভিল ডিফেন্সের মহড়া, ইন্টারনাল সিকিউরিটি ব্যবস্থার তদারক করা, ব্যবসায়ী মুনাফাবাজ দুষ্ট লোকেরা যাতে অবস্থার সুযোগ নিতে না পারে, যাতে প্রাইস রাইজ না হয়, জরুরী অবস্থায় এসবই গভর্মেণ্টের একমাত্র লক্ষ্য। সরকারের একমাত্র করণীয়। রাইটার্সে এবং লালবাজারে আরমি-পুলিস সিভিল ডিফেন্সের জয়েন্ট কন্ট্রোল রুম খোলা হল।

অরুন্ধতী দেখলেন, এই চোদ্দটা দিন ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেন কোন রাজনৈতিক দল নেই। পাড়ায় পাড়ায় মারামারি খুনোখুনি নেই। লাঠিসোঁটা, বন্দুক নিয়ে পারটিতে পারটিতে লড়াই বন্ধ। নকশাল, সি পি এম, কংগ্রেস কারও কোন দৌরাত্ম্য নেই। কারও সঙ্গে কারও ঝগড়া নেই। মহাকরণেও এমপ্লয়িজরা এজিটেশন করছে না। যে যার কাজ আপন মনে করছে। অফিসে আসছে। বাড়ি যাচ্ছে। সভা করছে না, শ্লোগান দিচ্ছে না। যেন কারও কোন দাবিদাওয়া নেই। অরুন্ধতীর রাইটার্স বিল্ডিংসের জীবনে এ-একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। শুধু মহাকরণে নয়, সারা কলকাতার লোকের কাছেও এ-এক নতুন অভিজ্ঞতা। সকলে সকালে উঠে খবরের কাগজ দেখে, ম্যাপ খুলে মিলিয়ে নেয়। ভারতীয় সৈন্য

কতদূর এগোল। আজ যশোর, কাল খুলনা, পরদিন সিলেট। ভারতীয় সৈন্য কবে ঢাকা দখল করবে? সকলের মনে সেই প্রশ্ন।

দেখতে দেখতে কিন্তু একদিন যুদ্ধও শেষ হয়ে গেল। বাংলাদেশ এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে পৃথিবীর মানচিত্রে উদিত হল। ন'মাস পরে একদিন মুজিবও ছাড়া পেলেন। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে লণ্ডন। তারপর লণ্ডন হয়ে ঢাকার পথে দিল্লী। পরে আর একবার ঢাকা থেকে কলকাতা এলেন। রাজভবনে রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দুদিন রইলেন। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে একটা পাবলিক মিটিংয়ে বক্তৃতাও দিলেন।

সবকিছুই আবার সেই আগের মত স্বাভাবিক হয়ে এল। কলকাতা সেই আগের কলকাতা। মহাকরণ সেই আগের মহাকরণ।

খবরের কাগজের পাতায় আবার খুন। জেল পালানোর ঘটনা। বন্দুক ছিনতাই। পলিটিকাল পার্টিতে পার্টিতে লড়াই। আজ এখানে খুন হচ্ছে, কাল সেখানে লোক মরছে। সব কিছুই যেন নিত্য-নৈমিত্তিক সাধারণ ঘটনা। কলকাতার লোকদের কাছে সব যেন গা-সওয়া।

লোকে স্নান করে ভাত খেয়ে আপিসে যায়। পাঁচটা বাজতেই আবার ফিরে আসে। সিনেমা দেখে। পার্কে হাওয়া খেতে বেরোয়। পাড়ায় গুলি চললে কিংবা ডেডবডি পড়ে থাকতে দেখলে কিছু সময় পরেই লোকে আবার রাস্তায় বেরোয়। ছেলে-মেয়ে পুরুষ সকলেই মার্কেটিংয়ে যায়। একটু আগেই এ পাড়ায় দুটো খুন হয়েছে, কিছুক্ষণ আগেও রাস্তায় বডি পড়ে ছিল, রক্তের দাগ তখনও পিচের রাস্তা থেকে শুকোয়নি—সেসব কথা কিন্তু লোকের মনে থাকে না। কিংবা মনে রাখতেও তারা পারে না। এ সব-কিছুই যেন স্বাভাবিক ঘটনা। এসবের বাইরে যেন আর কিছু নেই।

আবার একই সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় বেরোয় মিছিল। পোস্টার,

প্লাকার্ড হাতে নিয়ে লোকে শ্লোগান দিতে দিতে এ রাস্তা সে রাস্তা ঘোরে। মিটিং করে। এ সবই যেন এ শতাব্দীর কলকাতা।

অরুন্ধতী আবার সেই দশটা বাজতে আপিসে যান। কাজকর্ম করেন। আবার যথারীতি ফিরে আসেন। মহাকরণের সেই আপিস-জীবনও আগের মত একই ভাবে চলল। দেখতে দেখতে সব কিছুই আবার থিতিয়ে গেল। লোকে আবার সেই আগের মত আপিস আসে লেট করে। আবার ছুটি হবার আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। আপিস আওয়ার্সেই আপিসের মধ্যে বসে শ্লোগান দেয়। অফিসারদের ঘেরাও করে। দপ্তরে দপ্তরে মিটিং বসে।

এরই মধ্যেই একদিন চীফ সেক্রেটারীর ঘরে অরুন্ধতীর ডাক পড়ল। চীফ সেক্রেটারী গম্ভীর মুখে কোন কথা না বলে দিল্লী থেকে আসা টেলেক্স রিপোর্টের একটা চিরকুট অরুন্ধতীর হাতে তুলে দিলেন।

চিরকুটের উপর চোখ বুলোতেই অরুন্ধতীর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। দিল্লী অরুন্ধতী সেনকে তাঁর বর্তমান পদ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য বলেছে। কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। তবে বলা হয়েছে, প্রাইম মিনিস্টারের সেক্রেটারীয়েট থেকে অনুরূপ নির্দেশ এসেছে।

অরুন্ধতী চীফ সেক্রেটারীর মুখের দিকে একবার তাকালেন। চীফ সেক্রেটারীর মুখটাও থমথমে।

চীফ সেক্রেটারী একবার জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কোথায় যেতে চাও বলো ?'

অরুন্ধতীর কান্না পেয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রথমে কথা বলতে পারলেন না।

'কিন্তু স্যার—' অরুন্ধতী তাঁর কথাটাও ভাল করে শেষ করতে পারলেন না।

চীফ সেক্রেটারী বললেন—'হোল ব্যাপারটা আমার কাছেও একটা মিস্ট্রি অরুন্ধতী। আমি দিল্লীর কাছে ব্যাপারটা ডিটেলসে

জানতে চেয়েছি। দেখি। এনিওয়ে, ইউ ডোণ্ট গেট আপসেট ইয়ং গার্ল। তুমি ছুটি নাও, ইউ ক্যান গো অন লিভ।'

অরুন্ধতী এরই মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছিল।—'ঠিক আছে স্যার। আই অ্যাম রেডি টু গো এনি হোয়্যার। আমি স্যার ছুটিতে যেতে চাই না।'

অরুন্ধতী ভাবলেন, এ ভালই হল। আপিস আর বাড়ি, বাড়ি আর আপিস করে তাঁর খুব স্ট্রেন পড়ছিল। ক'দিন ধরেই খুব টায়ার্ড ফিল করছিলেন। কিছুদিনের বিশ্রাম প্রয়োজন। ঠিক করলো কলকাতার বাইরেই কোথাও পোস্টিং নেবে।

এর পরে সত্যি সত্যিই একদিন জয়েণ্ট সেক্রেটারী ফর হোম অরুন্ধতী সেন ডেপুটি কমিশনার অফ জলপাইগুড়ি পোস্টিং নিয়ে নর্থ বেঙ্গল চলে গেলেন। আর স্মল অ্যাণ্ড কটেজ ইণ্ডাস্ট্রির জয়েণ্ট ডাইরেক্টর দিব্যেন্দু দত্ত তাঁর আগের পোস্টিংয়ে ফিরে এলেন। অরুন্ধতীর জায়গায় চব্বিশ পরগণার ডি এম-এর পোস্টিং হল।

তারও কিছু দিন পর নর্থ বেঙ্গলের ডি সি অরুন্ধতী সেন চীফ সেক্রেটারীর কাছ থেকে একটা বড় খামে আঁটা চিঠি পেলেন। তাতে তিনি অরুন্ধতী সেনের কাছ থেকে কতকগুলি প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন।

অরুন্ধতী সেনের সঙ্গে এক শ্রেণীর নকশাল যুবকদের যোগাযোগ ছিল কি না? অরুন্ধতী সেন ক্যালকাটা পুলিসকে ইনফ্লুয়েন্স করিয়ে পাঁচজন খুনের চার্জে আটক নকশালকে রিলিজ করিয়েছেন কি না? দুটো পুলিস খুনের চার্জে একদা আটক তরুণ নকশাল নেতা সুব্রত গুপ্ত অরুন্ধতী সেনের ক্লোজ রিলেশান কি না? এ রকম আরও কতকগুলো প্রশ্ন। অরুন্ধতী সেন সব ভাল করে

পড়লেনও না।

চীফ সেক্রেটারী লিখেছেন, দিল্লী তাঁকে জানিয়েছেন যে, কলকাতার সেণ্ট্রাল ইণ্টেলিজেন্সের এক সিক্রেট রিপোর্টের উপর বেস করেই সেণ্টার অরুন্ধতী সেনকে অন্যত্র সরিয়ে দেবার সুপারিশ করেছিল।

বর্তমান জরুরী অবস্থায় ওরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে দিল্লী অরুন্ধতী সেনকে রাখতে চান না।

চীফ সেক্রেটারী নিজে অবশ্য এসবের উত্তর অরুন্ধতী সেনের কাছ থেকেই শুনতে চান। তাঁর ধারণা, এ ব্যাপারে কেউ ম্যালাইন করেছে। এ সব অভিযোগ ভিত্তিহীন।

অরুন্ধতী সেন ভাবলেন, তিনি এর জবাব দেবেন। পরেই ভাবলেন, এর কী-ই বা জবাব দেবেন। এর আবার জবাব হয় নাকি!

কলকাতার এস আই বি-র লোকদের সঙ্গে তাঁর এক সময় পরিচয় ছিল। ওঁদের ইণ্টেলিজেন্স ওয়ার্কের কিছু কিছু নমুনাও তাঁর জানা ছিল। এবার আরও একবার জানলেন। তিনি আপন মনে একবার না হেসে পারলেন না।

—